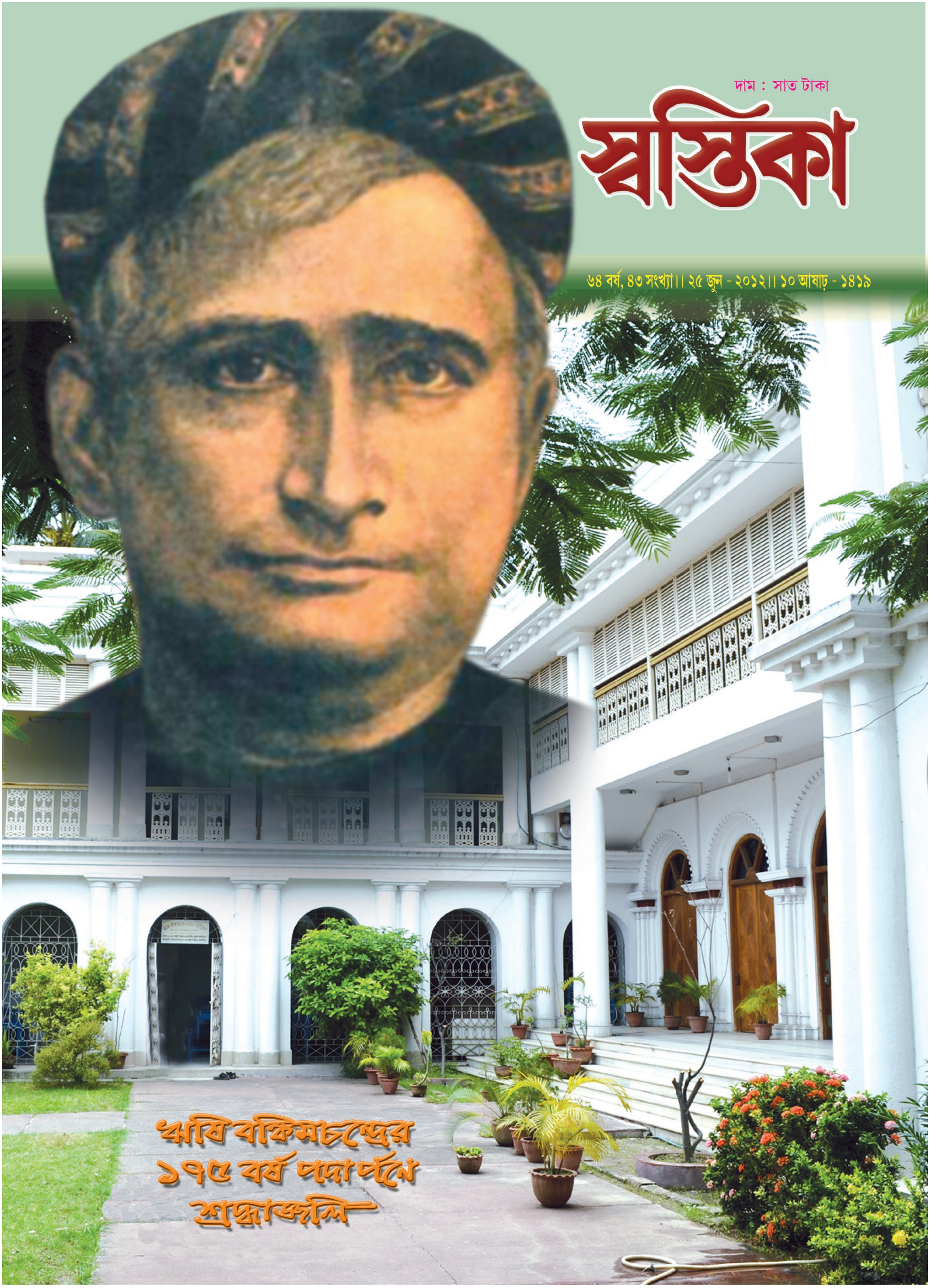
দাম : সাত টাকা
স্বস্তিকা
৬৪ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ২৫ জুন - ২০১২।। ১০ আষাঢ় - ১৪১৯
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
১৭৫ বর্ষ পদার্পনে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

রাইসিনা হিলের রাষ্ট্রপতি ভবনে একজন দলীয় ভৃত্যকে দেখতে চান সোনিয়া □ ৯

অনিল বসুর বহিষ্কার কিছু অপ্রিয় সত্যকে সামনে এনেছে □ ১০

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম থেকে আজকের বাঙালিকে শিক্ষা নিতে হবে □ দুলাল চন্দ্র দে □ ১১

বঙ্কিম প্রতিভা □ বিপিন চন্দ্র পাল □ ১৩

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ □ অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় □ ১৫

সনাতন ও হিন্দু দর্শনের প্রেমিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-ভাবনা □ ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৭

বঙ্কিমচন্দ্র (সনেট) □ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী □ ১৭

বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরম্ : একটি সমীক্ষা □ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৯

তব ভুবনে তব ভবনে □ অর্ণব নাগ □ ২২

পৌরাণিক নগর অযোধ্যা □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২৪

লৌকিক দেবতা খাঁদুরাণী □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২৫

খোলা চিঠি : বসুতে বসুতে লড়াই ; শুদ্ধ সর্বহারা বনাম অশুদ্ধ সর্বহারা □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭

আর্থিক সঙ্কটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন □ ডঃ অশ্বিনী মহাজন □ ২৮

কেরলে একের পর এক খুনে অভিযুক্ত সি পি এম □ ৩৩

'ভক্তি-ক্ষীর' ও 'জ্ঞান-মিশ্রী' সহযোগে ক্ষীর-সমুদ্রে অবগাহন □ শ্রীভিক্ষুদেব ভট্টাচার্য □ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা : ২৬ □ □ নবাঙ্কুর : ৩০-৩১ □ □ চিঠিপত্র : ৩২ □ □ খেলা : ৩৫ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৮-৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ১০ আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৫ জুন - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

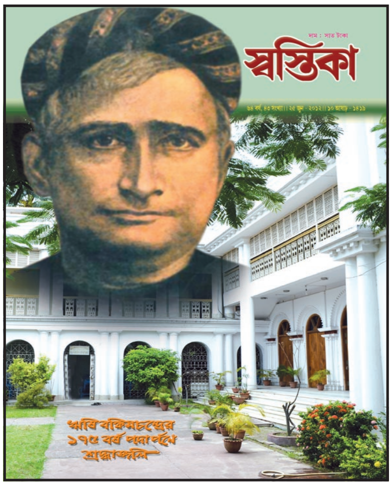

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ সংখ্যা
পৃঃ ১৩-২৩

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬
হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

যে কাশ্মীরকে ভারতে পূর্ণ বিলয়ের দাবিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আত্মবলিদান করেছিলেন, স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে আমাদের জাতীয় নেতাদের দূরদর্শিতার অভাব ও ঔদাসীন্যেই কাশ্মীর এখনও আমাদের গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অবদানকেও। এসবেরই পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন তথাগত রায়, ও পি গুপ্ত, কে কে গাঙ্গুলী, বাসুদেব পাল প্রমুখ।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে থাকছে নানা তথ্য। সব মিলিয়ে এক সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা।

দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

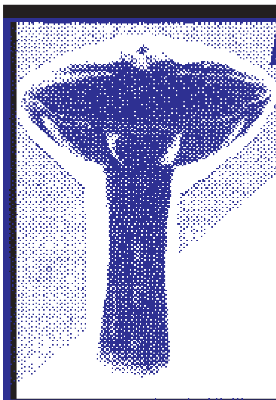

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কালো টাকা লইয়া শ্বেতপত্র

ভারতীয়দের ব্যাপক পরিমাণ 'কালো টাকা' অর্থাৎ হিসাব বহির্ভূত তথা অসাধু উপায়ে উপার্জিত অর্থ সুইজারল্যান্ডে দীর্ঘকাল যাবৎ জমা রহিয়াছে। ভারতবাসীদের একটা বিরাট অংশই ইহা বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস না করিবার কোনও কারণ নাই। কেননা সাম্প্রতিক সময়ে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি ও শ্বেতপত্র এবং 'সুইস ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে'র বার্ষিক হ্যান্ডবুকে প্রকাশিত তথ্যে 'কালো টাকা'র উপস্থিতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে একটু রকমফের অবশ্যই আছে। ভারত সরকার এবং সুইস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ গচ্ছিত 'কালো টাকা'র যে পরিমাণটা জানাইয়াছেন তাহা হিমশৈলের উপরিভাগ মাত্র। কয়েক হাজার কোটি টাকা। শ্বেতপত্রে কালো টাকার মালিকদের নামোল্লেখ নাই এবং কিভাবেই বা উহা উদ্ধার করা যাইবে তাহার কোনও দিশাও নাই। প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহা হইলে কালো টাকা উদ্ধারের ভবিতব্য কি? বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে যোগগুরু বাবা রামদেব এবং তাঁহার সহযোগী প্রয়াত রাজীব দীক্ষিত ভারতবাসীকে জানাইয়াছিলেন যে, বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ভারতীয়দের 'কালো টাকা'র পরিমাণ কমপক্ষে তিনশত লক্ষ কোটি টাকা। যাহা দিয়া ভারতবর্ষের কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হইতে পারে।

বস্তুতপক্ষে ভারত সরকার 'কালো টাকা' স্বদেশে ফেরত আনিবার জন্য আদৌ আন্তরিক নহেন। বরং তাহাদের ঘনিষ্ঠ কতিপয় কালো টাকার কুমীরকে বাঁচাইতে তৎপর— ইহাই তাহাদের কাজেকর্মে বাস্তবায়িত হইতে দেখা যাইতেছে। কালো টাকা এবং দুর্নীতি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সমাজকর্মী আন্না হাজারে এবং যোগগুরু বাবা রামদেব-এর দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন দমনে ভারত সরকার যতটা সক্রিয়তা এবং অতিশয় সক্রিয়তা দেখাইয়াছেন তাহার শতাংশের এককণাও দুর্নীতি দমনে দেখাইতে পারেন নাই। পারেন নাই মুদ্রাস্ফীতি রোধ অথবা নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য হ্রাস অথবা নিয়ন্ত্রণ করিতে। অথচ দুই নামজাদা অর্থনীতিবিদ অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়া এই দেশের ১২০ কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করিতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে কালো পথে অর্জিত কালো টাকা বিপুল পরিমাণে বিদেশে গচ্ছিত করিয়া রাখিবার বিষয়টি জনসমক্ষে আসিয়াছিল বিরোধী রাজনৈতিক দল ও দলনেতাদের বারংবার উত্থাপনের মাধ্যমে। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধী। তাঁহার নামেই বিরোধীরা 'বফর্স কামান' ক্রয়ে কাটমানি হস্তগত করিয়া বিদেশে গচ্ছিত রাখিবার অভিযোগ করিয়াছিলেন। পরিণামে ১৯৮৯-এর নির্বাচনে (১৯৭৭ সালের পর) অকংগ্রেসী সরকার, দিল্লীর মসনদে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রতীক বলিয়া পরিচিত মান্ডার রাজা বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং। তাঁহার সরকার স্বল্প সময়ের কার্যকালে পূর্ব অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এমনকী— ছয়বছরের এন ডি এ সরকারও কালো টাকার মালিকদের পর্দায় ঢাকা মুখগুলিকে জনতার দরবারে হাজির করিতে পারেন নাই। যদিও বাবা রামদেব মুখর হইবার পূর্বেই ২০০৯-এর সংসদীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে গচ্ছিত কালো টাকা দেশে ফেরত আনিবার গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। এন ডি এ দিল্লীর ক্ষমতা দখল করিতে না পারায় তাহা ধামাচাপা পড়িয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে দেশের জাগ্রত জনগণ যতদিন পর্যন্ত না ভালোমন্দ বুঝিয়া সঠিক দল ও ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিতেছেন ততদিন কালো পথে উপার্জিত কালো অর্থ বিদেশে জমা হইতে থাকিবে আর দেশে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। হাজার লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎকারীদের নাম প্রকাশ্যে আসিবে না আর মাত্র ২/৩ লক্ষ লইবার কারণে কিছু ব্যক্তি গারদের অভ্যন্তরে কাল কাটাইতে থাকিবে। এই সবকিছুর মূল নিয়ন্তা অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনে আনন আবৃত রাখিবেন। দেশের অর্থব্যবস্থাকে রসাতলে পাঠাইয়া ব্যাপক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারিগরকে সর্বোচ্চ আসনে সবাইতে দেশবাসী উর্ধ্ববাহু হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে আম-আদমীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। সরকারি শ্বেতপত্র দেখিয়া মনে হয় ইহা ভারতবাসীর ভবিতব্য।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ফল কামনা কর কেন? আমাদের কেবল কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। ফল যাহা হইবার হইতে দাও। কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতা নাই—এইরূপ অসহিষ্ণুতার জন্য শীঘ্র ফলভোগের আকাঙ্ক্ষায় সে যে-কোনও একটা মতলব লইয়া তাহাতেই লাগিয়া যায়। জগতের অধিকাংশ ভাবী সংস্কারককেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

মাওবাদী নেতার কথায় প্রকাশ

ভারতজুড়ে মাওবাদীদের নিজস্ব অস্ত্র কারখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের সাতটি অস্ত্র কারখানা ভালোভাবে চলছে। জেরার উত্তরে একথা জানিয়েছেন প্রথম সারির মাওবাদী নেতা সদানালা রামকৃষ্ণ। প্রসঙ্গত, এই মাওবাদীটিকে কলকাতা পুলিশের বিশেষ

টাস্ক ফোর্স সাদা পোষাকে গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতার ব্যস্ত কলেজ স্ট্রীট এলাকা থেকে একরকম ফিল্মি কায়দায় দিন-দুপুরে পাকড়াও করেছিল।

মাওবাদীরা ২০০১ সালে ওই রামকৃষ্ণের নেতৃত্বেই সাত সদস্যের সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটি নিয়ন্ত্রণ করে সিপিআই (মাওয়িস্ট) দলের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশন। ব্যাপক পরিমাণে অস্ত্র তৈরি হোত সাব-কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে কয়েকটি লেদ কারখানায়।

উৎপাদন কেন্দ্রগুলি সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের অধীনে বিভিন্ন কোড নামে কাজ করত। যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য সমিতির নাম এস-১, এস-২ নামটি ব্যবহৃত হোত উত্তর তেলেঙ্গানার বিশেষ জোনাল কমিটির জন্য। এস-৩ দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটি, এস-৪ বিহার, এস-৫, কর্ণাটক, এস-৬, পশ্চিমবঙ্গ এবং এম-৭, মহারাষ্ট্র-র জন্য ব্যবহৃত কোড নাম।

সি টি সি বা সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল কমিটির সভা হোত প্রতি তিন মাসে একবার, আর সেই সভায় সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের সদস্যরা বছরে একবার উক্ত সভায় যোগ দিয়ে পরিকল্পনা ছকে দিতেন। এই সভা বা বৈঠক বেশির ভাগই হয়েছে ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলায়, বছরে একটা সভা অবশ্য ছত্তিশগড়ের দণ্ডকারণ্যে হোত বলে জানা গিয়েছে।

সিটিসি-র কাজকর্মের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র রিপেয়ার করা, উন্নত ধরনের পাইপগান, গ্রেনেড ও লঞ্চার তৈরি করা এবং গ্রেনেড টেকনলজি ও রকেট লঞ্চার টেকনলজি উন্নত করাও রয়েছে। পয়েন্ট বারো বোরের গুলি বা কার্তুজ এবং রকেট প্রপেলড গান, আগ্নেয়াস্ত্রের যন্ত্রাংশকে জোড়া দেওয়া এবং ইমপ্রোভাইজড্ রকেট লঞ্চার তৈরি করাও অন্যতম কাজ ছিল। তবে তারা রিভলবারকে উন্নত করার গবেষণায় ব্যর্থ হয়।

সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের নির্দেশে সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল কমিটির আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করা এবং তা দলের (সিপিআই-মাওবাদী) বিভিন্ন শাখাকে যোগান দেওয়াটা বাধ্যতামূলক ছিল। বিভিন্ন সাহিত্য পড়ে এবং ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঘেঁটে সদস্যদের ওয়াকিবহাল করাটাও সিটিসি-র অতিরিক্ত দায়িত্ব।

রামকৃষ্ণ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং অত্যন্ত দক্ষ। সিটিসি-র প্রমুখ। ২০০৫-এ সে টেকনিক্যাল রিসার্চ এবং আর্মস্ ম্যানেজমেন্ট (TRAM) শাখার প্রমুখ হয়। এখানে (TRAM) ১৫ জন সদস্য। এরাও R-1, R-2, R-3 প্রভৃতি নামে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, বিহার, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশে সক্রিয় ছিল।

এন আই এ গোয়েন্দাদের মতে রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তারের আগেই TRAM (Technical Research and Arms Management) কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই হাজার রকেট লঞ্চার সাপ্লাই করেছিল এবং ১০০০ থেকে ১২০০ রকেট লঞ্চার তৈরির যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে এন আই এ মামলাটি তদন্ত করছে।

TRAM-এর হাতে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক তৈরি ছাড়াও যোগাযোগের যন্ত্রপাতি বানানোর দায়িত্ব ছিল। এছাড়া মায়ানমার ও বাংলাদেশ থেকে চোরাকারবারীদের মাধ্যমে এদেশে নিষিদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করত। রামকৃষ্ণ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে ভেল-এ (ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ লিঃ) ১৯৭৫-৮২ পর্যন্ত চাকরী করেছে। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময় চাকরি ছাড়ে এবং পরে মাওবাদীদের দলে যোগ দেয়। অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন স্থানে সে 'রেড-লিটারেচার লাইব্রেরি' গড়ে তুলেছিল। মহারাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানে অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রও স্থাপন করেছিল। তার মধ্যে নেরুল অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রটি সম্প্রতি পুলিশ নষ্ট করে দেয়। এই মামলায় চারজনকে এন আই এ গ্রেপ্তার করেছে। আরও কয়েকজনকে খুঁজছে।

ইসলামি মৌলবাদীদের মদত দিচ্ছে আমির খানের রিয়ালিটি শো 'সত্যমেব জয়তে'?

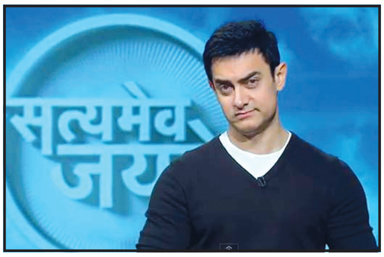

সংবাদদাতা ॥ বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেক টিভি দর্শকই বিপুল আগ্রহে বলিউডের তারকা আমির খান পরিচালিত 'সত্যমেব জয়তে' নামের একটি ধারাবাহিকের ওপর বিশেষভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। কোনও অনুষ্ঠান মানুষজনের ভাল লাগলে সেটির প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে কারণেই অনেকে অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা তো করছেনই, অনেকে আবার এস এম এস করে আরও পাঁচজনকে জানাতে অনুরোধ করছেন যে অনুষ্ঠান তাঁদের খুব ভাল লাগছে। অনুষ্ঠান সম্প্রচারকদেরও এস এম এস পাঠিয়ে তাঁরা অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তার সপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছেন। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এটি জনরুচির স্বাধীনতা। অনুষ্ঠানটি অশ্লীল বা হিংসাত্মক না হলেই হলো। এই অবধি সবই আপাততভাবে ঠিক আছে। কিন্তু 'পর্দে কে পিছে কেয়া হ্যায়—'? অনুসন্ধান সূত্রে জানা গেছে বহু মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের দ্বারা ঘোষিত একটি সংস্থার নামে অনুদান পাঠাতে শুরু করেছেন। এসবই উদ্যোক্তরা নাকি জনস্বার্থে করছে। অনুসন্ধানের সূত্রে এই অনুদানের টাকা কোথায় যাচ্ছে তার একটা হদিস মেলে। সকলের অবগতির জন্য একথা জানানো প্রয়োজন যে, অনুদানের অর্থ Humanity Trust নামে একটি জনহিতকর সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে। এই তথাকথিত জনহিতকর ট্রাস্টটির website খুলে জানতে পারা গেছে যে এই ট্রাস্টটি গঠন করার মূল উদ্দেশ্য দুটি, (১) মুসলমানদের মসজিদ গড়ার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান।

(২) ইসলামি যুবক-যুবতীদের চাকরী-বাকরীর সন্ধান দেওয়া। এই ট্রাস্টের ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে চাকরীর ব্যাপারে শুধু ইসলামি যুবক-যুবতীরা যাতে সুযোগ পায় তা দেখা।

ওয়েবসাইটটির পরিচয় http:/www.facebook.com./I/bAQE0HNX2/ www.humanitytrust.com/ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে যে কেউ এটি দেখে নিতে পারেন।

এবারে আসল কৌশলটা দেখুন। দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকেই বিভিন্ন ধর্ম, মত, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষজন এসএমএস পাঠাচ্ছে, সঙ্গে সাধ্যমতো চাঁদাও পাঠাচ্ছে। অথচ এইভাবে সংগৃহীত অর্থ খরচ হচ্ছে একটি বিশেষ ধর্মের বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রশ্ন হচ্ছে, লোককে সঠিক ভাবে জানার সুযোগ না দিয়েই দেশবাসীর আবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের কাছ থেকে এভাবে টাকাকড়ি আদায় করা হচ্ছে কেন? এইভাবে আদায় করা টাকা যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হচ্ছে মানুষ সেটা জানতেও পারছে না। তাদের দানের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে বস্তুতঃ ঠকানো হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন সামনে এসে পড়ছে—

(১) মসজিদে ও মাদ্রাসার নির্মাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে গেলে আমাদের জাতীয় (National) কোন উপকার সাধিত হবে? যদি তা না হয় তাহলে কেন দেশের মানুষকে এইভাবে বোকা বানানো হচ্ছে? অথচ সবাই স্পিকটি নট হয়ে নীরব দর্শক হয়ে আছে!

দ্বিতীয়ত, আমাদের এই বিশাল দেশে শুধুমাত্র মুসলিমরাই কি বেকার হয়ে আছে? দেশবাসীর গরিষ্ঠাংশের মধ্যে কি সবাই কর্মরত? তা যদি না হয় তাহলে কেবল একটি ধর্মমতকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্য বহু ধর্মাবলম্বী দেশবাসীর সঙ্গে এমন বৈমাত্রেয় আচরণ কেন?

সি বি আই চার্জশীটের বয়ান

কেরলে কমিউনিস্টরা মুসলিম এবং আর এস এস-এর দাঙ্গা বাধাতে চেয়েছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেরলের কম্যুনিস্টরা যে মুসলিম ও আর এস এসের মধ্যে দাঙ্গা বাধাতে চেয়েছিল সম্প্রতি সিবিআই-এর দেওয়া চার্জশীটে তা উঠে এসেছে। কন্নুর জেলার তালাসেরিতে একদল হত্যাকারী ২০০৬-এর ২২ অক্টোবর প্রাক্তন সিপিএম কর্মী ফজলকে হত্যা করেছিল। ফজল সিপিএম ছেড়ে নবগঠিত 'ডেমেক্র্যাটিক ফ্রন্ট অফ্ ইন্ডিয়া' দলে যোগ দিয়েছিল। বর্তমানে ওই দলের নাম 'পপুলার ফ্রন্ট অফ্ ইন্ডিয়া'। ফজলকে হত্যার পরে পূর্ব-পরিকল্পনা মতো হত্যাকারীরা তার রক্তমাখা জামাকাপড় আর এস এস-এর স্থানীয় শাখাগুলির আশপাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। যাতে মুসলমান সমাজের পুরো রাগটা আর এস এস-র উপর গিয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়। বলাবাহুল্য হত্যাকারীরা সবাই সিপিএম আশ্রিত ছিল।

ওই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার পরে সিবিআই-এর হাতে ন্যস্ত হয়। সিবিআই দুই সিপিএম নেতা কারাই রাজন এবং কারাই চন্দ্রশেখরণ-এর নামে হত্যায় যুক্ত থাকার অভিযোগে চার্জশীট দিয়েছে। ফলে হত্যাকাণ্ডের পরে কন্নুর এর সিপিএম নেতারা সভাসমিতিতে প্রকাশ্যে মহম্মদ ফজলকে আর এস এস হত্যা করেছে বলে যে অভিযোগ জানাতেন তা আর ধোপে টিকছে না। সিপিএম এভাবেই গলাবাজি করে নিজেদের দুষ্কর্মের দায় অন্যের উপরে চড়িয়ে থাকে।

ফজল আবার তার দলের মুখপত্র 'তেজস' **(Thejas)**-এর এজেন্ট ছিল। এর ফলে সিপিএম-এর পত্রিকা 'দেশাভিমানী'র সার্কুলেশন কমতে থাকে। ফজল সি পি এম-এর টার্গেটে পরিণত হয়।

স্টিফেন ন্যাপের বইতে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য

দেশের হিন্দু মন্দিরগুলিতে লুঠপাট চালাচ্ছে সরকার

১৯৫১ সালের হিন্দু ধর্মীয় ও দাতব্য এনডাউমেন্ট আইন (Hindu Religious & Charitable Endowment) বলে রাজ্য সরকারগুলি যে কোনও সময় হিন্দু মন্দিরগুলি অধিগ্রহণ করতে পারে ও মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার কায়েম রাখতে পারে। এরকমও নাকি দাবি করা হচ্ছে প্রয়োজনে সরকার মন্দিরের স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই বিক্রিবাটা করে সংগৃহীত অর্থ মর্জিমাফিক খরচও করতে পারে।

এই মর্মে স্টিফেন ন্যাপ বলে এক বিদেশী 'crimes against India and need to protect Ancient Vedic Tradition' নামের একটি বই আমেরিকা থেকে প্রকাশ করেছেন। বইটি পড়লে ভারতবাসী হিসেবে স্তম্ভিত হতে হবে। বইটির তথ্য অনুযায়ী :

কয়েক শতাব্দী ধরে দেশব্যাপী ভক্তজন ও ধার্মিক শাসকদের অনুদানে যে শত শত মন্দির ভারত জুড়ে তৈরি হয়েছিল সেই সমস্ত মন্দিরের আয় আজ অহিন্দু মানুষদের উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। ঘটনাটি দেশে বলবৎ থাকা একটি কালা-কানুনের জোরেই চলছে বলে প্রকাশ।

বইটির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী 'টেম্পল এমপাওয়ারমেন্ট' আইন প্রয়োগ করে— শুধু অন্ধ্রপ্রদেশেই ৪৩ হাজার মন্দির সরকারি আওতায় এসে গেছে। এই বিপুল সংখ্যক মন্দির থেকে সংগৃহীত আয়ের মাত্র ১৮ শতাংশ অর্থ মন্দির কর্তৃপক্ষকে খরচ চালানো বাবদ দেওয়া হচ্ছে। বাকি ৮২ শতাংশ টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে তা অজ্ঞাত। লেখক ন্যাপের তথ্য অনুযায়ী জগৎ বিখ্যাত তিরুপতি-তিরুমালা মন্দিরও এই আগ্রাসন থেকে রক্ষা পায়নি। এই মন্দির থেকে বাৎসরিক ৩১০০ কোটি টাকা আয় হয় বলে প্রকাশ। লেখকের বিবরণ অনুযায়ী, এই আয়ের ৮৫ শতাংশই সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে, যার গরিষ্ঠাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনও কাজে খরচ হয় না। ভক্তেরা কি এমন একটা পরিণতির কথা জেনেই তাদের জীবনের সঞ্চয় ঈশ্বরের পদপ্রান্তে নিবেদন করেন?

বইটির আরও একটি বিস্ফোরক তথ্য থেকে প্রকাশ— অন্ধ্র সরকার ইতিমধ্যে ১০টি মন্দির ধূলিসাৎ করে ফেলেছে। অধিগৃহীত জমিতে গল্ফকোর্স তৈরির কাজ চলছে। লেখক ন্যাপ সুদূর আমেরিকা থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যদি দশটা মসজিদ ভাঙ্গা হোত তাহলে আজ ভারতবর্ষে কি ডামাডোলই না হোত!

ন্যাপের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কর্ণাটকের ২ লক্ষ মন্দির থেকে সরকার ৭৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করলেও মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাত্র ৭ কোটি টাকা দিয়েছে। হায়! বাকি ৭২ কোটি টাকার মধ্যে ৫৯ কোটি গেছে মুসলিম মাদ্রাসা ও হজ যাত্রীদের ভর্তুকিতে আর পড়ে থাকা ১৩ কোটি গীর্জার উন্নয়নে! লেখকের সংযোজন অনুযায়ী এই কারণেই কর্ণাটকের ২ লক্ষ মন্দিরের মধ্যে সরকার শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ ৫০ হাজার মন্দির বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছে। কারণ মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় রসদ নেই। তাঁর মতে নাগরিকদের তরফে কোনও প্রতিবাদ না আসাতেই সরকার এমন হিন্দু বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করছে না।

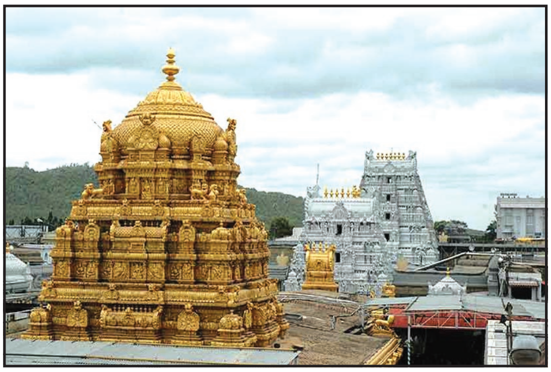

ন্যাপ লিখেছেন কেরলের গুরুভায়ুর মন্দির থেকে সংগৃহীত বিপুল সম্পদ অন্যান্য সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয়িত হচ্ছে। পরিণতিতে ৪৫টি হিন্দু মন্দির ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছে। এই পর্বেই আয়াপ্পা মন্দিরের আয়ত্তাধীন কয়েক হাজার একর জমি ও বনভূমি ইতিমধ্যেই চার্চ কর্তৃপক্ষের করায়ত্ত হয়েছে, এগুলি বিখ্যাত শবরীমালা মন্দিরের সম্পত্তি।

ন্যাপের দেওয়া তথ্যে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে ওড়িশার ঘটনা। জগতবিখ্যাত প্রভু জগন্নাথদেবের সেবার দীর্ঘ শতাব্দী ধরে নিবেদিত ৭০ হাজার একর জমি রাজ্য সরকার বিক্রি করে তাদের নিজেদের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে সরকারের পুঞ্জীভূত লোকসানকে সাফ করে, ফেলতে চাইছে।

এমন অপ্রতিহত গতিতে হিন্দু মন্দির লোপাট করার নীরব কাহিনীর কারণ হিসেবে দেশীয় মিডিয়ার দিকেই আঙুল তুলেছেন লেখক। ন্যাপ জানিয়েছেন এমন সব ঘটনা যাতে দেশবাসীর নজরে না আসে সেজন্য বিশেষত ইংরেজী সংবাদ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম যারা স্বভাবতই হিন্দু বিদ্বেষী তারা সবিশেষ যত্নবান। তারা কখনই এগুলি রিপোর্ট তো করেই না এবং হিন্দুর স্বার্থে আঘাত করছে এমন কোনও ঘটনাকে বিন্দুমাত্র সমবেদনার সঙ্গে বিবেচনাও করে না। ফলশ্রুতিতে এহেন হিন্দু বিরোধী সরকারি দুষ্কর্ম অনায়াসে সংঘটিত হয়ে চলেছে।

ন্যাপের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পৃথিবীর কোনও দেশেই কোনও সরকার এমনভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করে না ও শাসন জারি রাখে না। এমন কর্মকাণ্ড দেশের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপেরই নামান্তর। কিন্তু উল্লেখিত সৃষ্টিছাড়া কাজ ভারতবর্ষে অবলীলায় হয়ে আসছে। এখানকার সরকারি আমলারা হিন্দু মন্দিরগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে কেননা তারা খুব ভাল ভাবেই জানে তাদের যে কোনও অনৈতিক কাজেই কোনও বাধা আসবে না। ভারতবাসীরা এ সম্পর্কে চির-উদাসীন ও অসীম সহনশীলতার অধিকারী।

অসংখ্য হিন্দু তাদের চোখের সামনে নিজেদের সংস্কৃতির চিহ্নগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করছে। সময় কি হয়নি সোচ্চারে এর প্রতিবাদ জানানোর, নিজস্ব মত জনসমক্ষে আনার? নাগরিক সমাজ কি সরকারকে বাধ্য করবে না মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে? দেশের মানুষের তো জানার অধিকার আছে মন্দির সমূহের বিগ্রহগুলির অন্তরালে কোন গুপ্তলীলা চলেছে। একটা কথা ন্যাপ পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন "যে কোনও অছিলাতেই মন্দিরগুলিকে লুটের মাল করা যায় না।" হায়! ভারতবাসী নয়, বলছেন এক আমেরিকান।

গূঢ়পুরুষের

কলম

রাইসিনা হিলের রাষ্ট্রপতি ভবনে একজন দলীয় ভৃত্যকে দেখতে চান সোনিয়া

দেশ যখন একটা ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের চোরাবালিতে পড়ে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে ইউ পি এ জোটের শরিকদের লাঠালাঠি চুলোচুলি দেশের মানুষজন মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না। রাষ্ট্রপতি ভারতের সাংবিধানিক প্রধান। কিন্তু বাস্তবে তাঁর ক্ষমতা খুবই সীমিত। তবে এই পদে অনেক সাম্মানিক সুযোগ-সুবিধা আছে যা আমাদের সংবিধানে লেখা নেই। সেই সব সুবিধা কীভাবে পরিবারের কাজে লাগাতে হয় তা' বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই এই সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে একজন সৎ নির্লোভ, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষকেই নির্বাচিত করা উচিত। দুর্ভাগ্য, রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী নির্বাচিত হন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ইচ্ছায় ও সমর্থনে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রতিনিধিদের ভাবমূর্তি মোটেই ভাল নয়। অনেকেই নিয়মিতভাবে দুর্নীতির দায়ে মাঝে মধ্যেই তিহার জেলে ঢোকেন ও বেরোন। উত্তরপ্রদেশের যাদব কুলপতি মুলায়ম সিং এবং তাঁর দলের অনেক নেতাদের বিরুদ্ধেই বিপুল আর্থিক দুর্নীতির মামলা ঝুলে আছে। বিহারের একদা যাদব নেতা লালুপ্রসাদের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। বিহারে তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে পুরো রাজ্যটিকেই চোরেদের স্বর্গরাজ্য বানিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণের জয়ললিতা, করুণানিধি থেকে মহারাষ্ট্রের শারদ পাওয়ার সকলেই কোনও না কোনও সময় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ফেঁসেছেন। এঁরাই স্থির করেন রাষ্ট্রপতি কে হবেন। এঁরাই আন্না হাজারে, যোগগুরু রামদেবের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান প্রতিপক্ষ। এঁরাই সমবায় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রতিভা পাতিলকে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে দেশের রাজনীতিতে আর্থিক দুর্নীতির প্রধান ধারক ও বাহক হচ্ছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ক্ষমতা হাতে পেয়েই লুঠ শুরু করে দেয়। আজও তা একই গতিতে চলছে। কংগ্রেস যতকাল কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকবে ততকাল দেশে দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা বহাল তবিয়তে ছড়ি ঘোরাবে। প্রণববাবু বলেছিলেন, বিদেশী ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের যে কালোটাকা লুকানো আছে তিনি তা ফেরত আনবেন। আজও দেশবাসী জানেন না কালোটাকা ফেরত আনতে কী পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক নিয়েছে। তবে যেটা সবাই জেনেছেন তা হচ্ছে, সুইস ব্যাঙ্ক সহ ইউরোপের যে সব ব্যাঙ্কে ৪০ হাজার কোটি ডলার ভারতীয় চোরাকারবারিরা এতকাল লুকিয়ে রেখেছিল সেই অর্থ তারা সৌদি আরব সহ কয়েকটি আরব উপসাগরীয় দেশের ব্যাঙ্কে সরিয়ে নিয়েছে। সৌদি আরব স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ভারতীয় আমানতকারীদের জমা রাখা কালোটাকা গোপন

ও সুরক্ষিত রাখা হবে। সুইস ব্যাঙ্কের মতো তারা কালোটাকার মালিকদের নামের তালিকা ভারত সরকারকে দেবে না। একথা সকলেরই জানা যে আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আসা বিপুল অর্থ সারা বিশ্বে জেহাদ চালাতে সন্ত্রাসবাদীদের সরবরাহ করা হয়। দুর্নীতির মাধ্যমে সঞ্চিত ভারতীয়দের বিপুল কালোটাকা ঘুরপথে ভারতে সক্রিয় জেহাদি গুপ্তসংস্থাদের হাতে এলে অবাক হবার কিছু নেই। কংগ্রেস সারা দেশকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। সেই কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সারথি এবার ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন। আমরা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দু'হাত তুলে নৃত্য করছি একজন বাঙালি রাজনীতিক রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন বলে। আন্না শিবির থেকে সঠিকভাবেই দাবি করা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিপদের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত হোক। নিরপেক্ষ তদন্তে যদি নির্দোষ প্রমাণিত হয় তবেই প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রাহ্য হবে। কিন্তু ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিকাঠামোয় দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকরাই দেশের মাতব্বর। বিদেশের ব্যাঙ্কে কয়েক শ' কোটি টাকা লুকিয়ে রাখা নেই এমন বড় বড় 'মান্যবর' নেতা খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে। ঠগী বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। সন্দেহ নেই দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য কিছু অসাধু বড় বড় শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক মাতব্বর নেতারা দায়ী। তারাই কালোটাকার নোংরা খেলায় দেশে বিপুল মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গোষ্ঠী তাঁকে ভারতীয় আমানতকারীদের নামের তালিকা দিয়েছে। প্রণববাবু সেইসব অসাধু ব্যক্তিদের আড়াল করেছেন। কেন? হয়তো তালিকার ৯০ শতাংশ কালোটাকার আমানতকারীই কংগ্রেস দলের মাতব্বর পৃষ্ঠপোষক। রাষ্ট্রপতি পদে নিরপেক্ষ, অরাজনীতিক, সম্মানীয় ব্যক্তির বসা উচিত। প্রণব মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসী রাজনীতিক এবং তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগও আছে। মহারাষ্ট্রের একটি সমবায় ব্যাঙ্ককে প্রতারণার অভিযোগে যখন আদালতে মামলা চলছে তখনই প্রতিভা পাতিলকে একটি রাজ্যের রাজ্যপাল করে দেন সোনিয়া গান্ধী। উদ্দেশ্য ছিল প্রতারণার মামলা ধামাচাপা দেওয়া। পরে ফৌজদারী মামলার আসামীকে সোনিয়াজী দেশের রাষ্ট্রপতি করে দেন। রাষ্ট্রপতি হওয়াটা তিনি যেভাবে উপভোগ করেছেন তা একটা নজির হয়ে থাকবে। পুরো পরিবার, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পাঁচটা বছর মুঘল বাদশাদের মতো বিলাসে রাষ্ট্রপতিভবনে কাটিয়েছেন। বিশেষ রাজকীয় বিমানে পুরো পরিবার সহ অসংখ্যবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর সুপুত্র কয়েক কোটি টাকা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়লে রাষ্ট্রপতির অনুরোধে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে সোনিয়া গান্ধী রাইসিনা হিলের রাষ্ট্রপতিভবনে একজন দলীয় ভৃত্যকে দেখতে চান। দোষ দেওয়া যায় না। সোনিয়ার রাজনীতির শিক্ষা তাঁর শাশুড়ি মা ইন্দিরার কাছে। ইন্দিরার জমানায় দলের আজ্ঞাবহ ভৃত্য শ্রেণীর লোকজনই রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন। সেই ট্র্যাডিশনই সোনিয়াজীরা বজায় রাখতে চাইছেন। এমন ব্যক্তি চাই, যিনি চোখ বন্ধ করে নিজের নাম সরকারি ফাইলে লিখতে পারেন। এমন ব্যক্তি চাই, যিনি দেশের স্বার্থের পরিবর্তে দলের স্বার্থকেই বড় করে দেখবেন। সেদিক থেকে বিচার করলে এবার রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন সঠিক হয়েছে।

রাজ্য রাজনীতি

অনিল বসু'র বহিষ্কার কিছু অপ্রিয় সত্যকে সামনে এনেছে

নিশাকর সোম

একটা কথা খুবই স্পষ্ট যে, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়া হয় রাজনৈতিক নীতি ও কৌশলকে লক্ষ্য রেখে। সি পি এম এবং নানা রঙের কমিউনিস্ট নামধারীদের লক্ষ্যই হলো যেনতেন প্রকারেন কেন্দ্রীয় সরকার দখল করা। কাজেই ভোটবাজিতে অভ্যস্ত দলগুলি ভোটে জেতার জন্য ছল-বল-কৌশল অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না। আর এই ভোট সংগ্রহে যে নেতা সফল হন, তিনিই জনপ্রিয়। 'জো জিতা ওহি সিকন্দর'। ঠিক এমনিভাবেই অনিল বসুর উত্থান এবং অনিল বসুকে না সরালে হুগলী জেলাতে বিমান বসু অ্যান্ড কোং-এর কাজ করার স্থান থাকবে না। কারণ খুবই স্পষ্ট। বামফ্রন্টের প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরামবাগে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে-গুঁড়িয়ে সি পি এমের জয়ের পেছনের নায়ক আজকের বহিষ্কৃত অনিল বসু। সি পি এম অনেক অনিল বসু তৈরি করেছে। তাঁরা যেহেতু নেতাদের বশংবদ, তাই কি বহিষ্কার করা হচ্ছে না?

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই অলিখিত নিয়ম চালু আছে— নেতা-ভজাদের কোনও শাস্তি হয় না। জেলা নেতৃত্বের লড়াইতে রাজ্য নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করতে ভয় পায়। তাই তো অবিভক্ত সি পি এমের ২৪ পরগণা জেলা পার্টির দলাদলি এবং তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে শ্রমিক নেতা তথা সাংসদ নীরেন ঘোষের অভিযোগ নিয়ে পলিটব্যুরো সদস্য প্রয়াত বাসবপুন্নাইয়া কমিশনের বক্তব্য ছিল— দলাদলি এবং রাজ্য নেতৃত্বের ত্রুটি। কলকাতা জেলাতেও 'সেন বংশ' উত্থানের জন্য কৃষ্ণপদ ঘোষের ডানহাতকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা সফল হলো— রাজ্য নেতৃত্ব নীরব দর্শক। পীযূষ দাশগুপ্তকে বহিষ্কার করার পর তাঁর লেনিন সেন্টারে পীযূষবাবুর ভাই বাসব দাশগুপ্ত এবং সুদর্শন রায়চৌধুরীকে নিযুক্ত করা হয়। এসব কথা পীযূষবাবু এবং হরিনারায়ণ অধিকারী বলেছিলেন। অনিল বসু যা করেছেন, সে কাজ তো আরও কিছু নেতা-কর্মীও করে থাকেন। পার্টি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার পথিকৃৎ জ্যোতি বসু। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাধ পূরণ না হওয়াতে তিনি প্রকাশ্যেই তাকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে অনিল বসু বলেছেন, কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভোটাভুটিতে জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগকে ধূলিসাৎ করে আলিমুদ্দিনের দফতরে বিমান বসু অঙ্গভঙ্গি করে বলেছিলেন— 'জ্যোতি বসুর ছেলেকে নন্দনকাননে বসার সাধ ঘুচিয়ে দিয়েছি।' এই কারণেই জোতি বসু বিমান বসু বিরোধী ছিলেন।

এই বিমান বসু অ্যান্ড কোং বিনয় চৌধুরীকে বেলুড়মঠে কুমারী পূজায় যাওয়ার জন্য যারপরনাই সমালোচনা করেছিলেন। একথা তখন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমানে প্রতিটি জেলার জেলা সম্পাদক সহ জেলা সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি করার কাজে কলকাঠি নাড়ছেন বিমান বসু অ্যান্ড কোং। কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান জেলায় শ্রমিক অঞ্চলে কাজ করার জন্য কোনও রাজ্য নেতা যাচ্ছেন না। খালি ছড়ি ঘোরানোর কাজেই তাঁরা ব্যস্ত।

অনিল বসু বলেছেন, 'সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সম্পর্কে পার্টিকে জেলা কমিটিকে অন্ধকারে রেখে বুদ্ধ-নিরুপম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আর হলদিয়ার 'সম্রাট' জমি দখলের একটি সরকারি ডি. ও. ঝুলিয়ে সর্বনাশের পথ খুলে দিয়েছিল।' অনিলবাবুর বলেছেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই তাঁকে বহিষ্কার করা হলো।

এদিকে রেজ্জাক মোল্লা মুখ খুলেই যাচ্ছেন, কিছু হবে না। কারণ সুভাষ চক্রবর্তীও অনবরত মুখ খুলতেন, জ্যোতি বসুর বর্ম তাঁকে রক্ষা করে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে উন্নীত করেছিল। বুদ্ধবাবু অসুস্থ হয়ে পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় না গিয়ে নিজের আধিপত্য বজায় রেখে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সেই পথেই রেজ্জাক যাচ্ছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত রেজ্জাককে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করবে না।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিন্তু বিমান বসুর দায়িত্ব নেই। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পার্টির সম্পাদক থাকার দায়িত্ব থাকবে। বুদ্ধবাবুর দায়িত্ব নেই। তাঁর দায়িত্ব ধীরে ধীরে মহম্মদ সেলিমকে দেওয়া হচ্ছে। দায়িত্বের প্রাধান্য পাচ্ছেন নীলোৎপল বসু, হান্নান মোল্লা (পরাজিত সাংসদ)। প্রসঙ্গত এক জনসভায় সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা উত্তর ২৪ পরগণার জেলা পার্টির সম্পাদক গৌতম দেব বলেছেন, 'পার্টির পরাজয় বিপর্যয়ের জন্য আমি, গৌতম দেব দায়ী, দায়ী বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং প্রকাশ কারাতরা।' এতো রেজ্জাকের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। সি পি এম পার্টিতে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম (ইনার পার্টি স্ট্রাগল)-এর স্বাধীনতা নিয়ে সমালোচনা করতে না দেওয়া হলে পার্টি পরবর্তী ৩৪ বছরেও শক্ত, অপ্রতিরোধ্য বিরোধী দল হতে পারবে না। ঠিক যখন সারা ভারতের রাজনীতিতে ঝড় উঠবে তার সুযোগও নিতে পারবে না।

বিমান বসু সম্পর্কে অনিল বসু একটি কথা বলেছেন, 'বিমানবাবুর মধ্যে দয়া-মায়া, মমতা, মানবিকতা নেই।' একথা অতীব সত্য। আমাদের অনেক তথ্য প্রমাণ আছে, কিভাবে বিপন্নরা যখন তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি তাঁর অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। আর এই বিমান বসুদের পৃষ্ঠপোষকতায় মাহেশ্বরী অ্যান্ড কোং ফেঁপেফুলে উঠেছে। সি পি এমের সদস্যদের বাড়ির লোকজনকে মাহেশ্বরীদের কোম্পানিতে চাকরি করে দেওয়া হয়েছিল।

অনিল বসু বলেছেন— 'বুদ্ধবাবু ভোগবাদে পার্টিকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন।' একাজ না করলে তিনি ভোগবাদী হবেন কি করে? বুদ্ধবাবু বিলিতি সিগারেট খেতে অভ্যস্ত। তিনি নন্দন-এ তাঁর পছন্দের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যেই নিজেকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে থাকতেন। ফলে অন্য শিল্পীরা বিরক্ত হতেন। ঠিক তেমনভাবেই রাজ্যের বর্তমান নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী চলেছেন। তাই তো এক সঙ্গীত- শিল্পীকে পাঁচবার পুরস্কার দেওয়া হয়। অথচ প্রতুল মুখার্জীকে কিছুই দেওয়া হয় না।

সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। স্তাবক পোষণ নীতির ধ্বজা উড়ছেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম থেকে আজকের বাঙালিকে শিক্ষা নিতে হবে

দুলালচন্দ্র দে

সর্বনাশের শেষ সীমায় এলে সত্যকে চেনা যায় না, তখন মানুষকে দুষ্ট সরস্বতী ভর করে এবং কাজ না করে অকাজ করে ও এটাই তাকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়।

বাঙ্গালী ১৯০৫ সালে ভুল করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করে, ভাই ভাই বুদ্ধি তাকে গ্রাস করে, যে পূর্ব, পশ্চিম ভঙ্গ কার্জন করে দিয়েছিলেন তা বুঝতে না পেরে শুধু দর্প ভরে তার বিরোধিতা করে, যে মুসলমানের সঙ্গে তার একাত্মতা নেই, তাকে সঙ্গে না নিয়ে একার শক্তিতে ইংরেজদের এককভাবে অর্তকিত আঘাত করে তাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় কিন্তু বিহার ও অসম সংলগ্ন বিরাট অংশ কেটে বাদ দিয়ে দুই বাংলা এক করা হয় এবং বিষবৃক্ষ রোপন করা হয়। কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী চলে যায়। এ যে কত বড় পরাজয় তা সে তখন বোঝেনি। এর ফলে দিল্লীতে তার স্থানটা অন্যেরা দখল করে নেয়। বড় বড় বিপ্লবী নায়কেরা তাদের মধ্যে শুধু ধ্বংসের রাজনীতি ঢুকিয়ে দেয়— ফলে সে বন্ধুকেও পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিত। একে তো বয়কট আন্দোলন করে সে মুসলমানদের বিরোধী করে তুলেছিল (রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' দ্রষ্টব্য)। তার উপর স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে প্রায় একার চেষ্টায়। কারণ সর্বভারতকে সে পাশে রাখেনি— তাই দিল্লীর সমর্থন সে কখনও পায়নি এবং ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময় দেখা গেল দিল্লীতে তার ঠাঁই-ই নেই এবং এখনও সে দিল্লীতে অপাংক্তেয়। এদিকে গান্ধী ও দেশবন্ধুর কৃপায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠরা সব আসন, চাকুরী দখল করতে শুরু করে ও ১৯২০ সাল থেকে সারা বাংলায় তাণ্ডব চালায়। ১৯৩৭-এ আবুল কালাম আজাদের প্ররোচনায় কংগ্রেস মুসলিম লিগকে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করতে দেয়। নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দী বাংলাকে পুরোপুরি ইসলামরাজ্যে পরিণত করে ইংরেজের সাহায্য নিয়ে। এরা ১৯৪৭ পর্যন্ত টানা অত্যাচার চালায় হিন্দুদের উপর। তাতেও হিন্দুদের হুঁশ হয়নি।

গান্ধী হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কোনও গুরুত্বই দিতেন না, তিনি মুসলিম প্রেমে বিভোর হয়ে একতরফা হিন্দুদের শুধু সহ্য করতে বলেন। এই তোষণের ফলে ১৯৪৬-এর আগস্টে পাঠান পুলিশ ও সৈন্য দিয়ে সুরাবর্দী এক মারণ যজ্ঞ করে কলকাতায় এবং ৬ সপ্তাহ পরে নোয়াখালীতে। গান্ধী নোয়াখালী গেলেন মুসলমানদের আক্রমণ রোধে কিন্তু সেটা করতে ব্যর্থ হয়ে বিহারে গিয়ে বলে গেলেন হিন্দুর হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে! বাঙ্গালী এসব দেখেও কিছু বলেনি, গান্ধীর পদলেহনই করেছে। চিত্তরঞ্জন মুসলমানদের জন্য ৮০ শতাংশ সংরক্ষণ দাবী করে ৬০ শতাংশ রক্ষা করেন— ফলে বাংলার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, রাইটার্স, পুলিশ সর্বত্র সমস্ত মুখ্য পদ মুসলমানরা দখল করে বিনা প্রতিযোগিতায় এবং দাঙ্গায় এরা মুসলমানদের প্রভূত সাহায্য করে। গান্ধী শেষ চালটি দেন। যখন জিন্না দেশভাগে সফল হলেন তখন ডঃ আম্বেদকর-সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লোকবিনিময় দাবী করলেন, সেটা গান্ধী বানচাল করলেন এই বলে যে মুসলমানরা কেন ভারত ছেড়ে যাবে? ভারত হিন্দুদের বাপের দেশ নয়। কল্পনাবিলাসী জওহরলাল তাকে সমর্থন করলেন— বাঙ্গালীরা চুপ করে রইল। ফলে ভারতভাগের পরও মুসলমানরা ভারতে পা রাখার জায়গা পেল এবং হিন্দুদের ক্রমাগত ভুল ও মুর্খামির সুযোগে নিজের সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়ে চলল— সঙ্গে চলল পাক-বাংলাদেশ থেকে অনবরত অনুপ্রবেশ। কিন্তু এই সঙ্গে ক্রমাগত দেশত্যাগ করে বহু লোক পশ্চিমবঙ্গে এবং সামান্য কিছুলোক ত্রিপুরায় ও প্রবল বাধার মুখে অসমে চলে আসেন। বাকি দেড় কোটি পূর্ব পাকিস্তানেই পড়ে থাকেন ও অনবরত নিগ্রহ সহ্য করে প্রায় ভিখারীর জীবন-যাপনে বাধ্য হন।

১৯৭১ সনে ইন্দিরা গান্ধী বিনা চিন্তায় পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠিয়ে মুসলমানদের পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ পাঠানদের থেকে মুক্ত করে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাতকদের হাতে দেশভার তুলে দিয়ে (প্রায় ১২,০০০ সৈন্যের প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে) চলে আসেন হিন্দুদের রক্ষার কোনও ব্যবস্থা না করেই। সে সময় উভয় বাংলার হিন্দুরা বাংলাদেশের জন্মলাভে সমর্থন ও সহায়তা করে। ইন্দিরা ৯৩,০০০ পাক্ সৈন্যকে আটক ও বিচার না করেই ছেড়ে দেন। বাংলাদেশ কাল বিলম্ব না করে ভারত বিরোধিতায় নেমে পড়ে। এবং ভারতে ওই সময় পাকসেনার অত্যাচারে প্রাণভয়ে এক কোটির উপর যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল যুদ্ধাবসানে তারা দেশে ফিরতে চাইলে মুসলমানরা বাধা দেয় যাতে তারা দেশে ফিরে সম্পত্তি পুনরায় না অধিকার করে। ওই সময়ে বাংলাদেশীরা দাবী করে যে ৩০ লক্ষ লোককে পাকিস্তানীরা হত্যা করেছে। এখন জানা গিয়েছে তার ৯০ শতাংশই ছিল হিন্দু। এখানেই শেষ নয়। তারা এখন ব্যাপক হারে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে অনুপ্রবেশ করছে। তাদের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। এসব তথ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রাহ্য তো করেইনি বরং তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করছে। বেআইনি সংরক্ষণ ১০ শতাংশ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, দশ হাজার মাদ্রাসার বৈধকরণ ও তাদের শিক্ষায় সব খরচ। মুসলিম তোষণে কি বামেরা কি বর্তমান শাসক সবাই সমান। সেই সুযোগ নিয়ে মুসলমানেরা সৈন্য বাহিনী ও পুলিশে ঢোকার জন্য সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলমানেরা ব্যাপক হারে যত্রতত্র দাঙ্গা বাধাচ্ছে

একতরফা— হরিণঘাটা, দেগঙ্গা, কুলতলি, মগরা তার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

প্রণব মুখার্জি তিন পুরুষ ধরে নেহরুদের সেবাদাস হয়ে আছেন, তিনি ইন্দিরার মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রীর পদের চেষ্টা করে পরাজিত হয়ে সীতারাম উপন্যাসের গঙ্গারামের মতো পরাজয়ের পর শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করে তাদেরই সেবায় নিযুক্ত, কারণ দিল্লীতে বাঙ্গালীদের কোনও প্রতিষ্ঠা নেই। আর এই নিরন্তর সেবার কারণেই আজ রাষ্ট্রপতি পদে তিনি গান্ধী-নেহরু পরিবারের মনোনীত প্রার্থী। আর সেই প্রার্থী হবার সুবাদে রাজনীতি থেকে তাঁর চির-বিদায়ের পথও প্রশস্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্যের শাসনে থেকেও হিন্দুরা ভোটের ভিক্ষায় মুসলমানদের সমানে ভজনা করেই চলেছে। এর থেকে নিস্তার নেই। নীরদ সি চৌধুরী বলেছিলেন, ভোটের জন্য সারা জীবন মুসলমানদের মুখাপেক্ষী থাকবে, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুসলমানরা যা খুশী তাই দাবী করবে। পূর্ব পাকিস্তানে একসময় হিন্দুদের আলাদা ভোট ব্যবস্থা ছিল। ফলে দেখা গেল যুযুধান দু'দলই হিন্দুদের ভজনা করছে সমর্থনের জন্য। যেই মুহূর্তে এটা মাথায় গেল— অমনি তারা এ ব্যবস্থা বাতিল করে দিল— এবং ভোট যাতে প্রভাবিত না করতে পারে, তাই এদের এখন ভোট কেন্দ্রেই যেতে দেয় না।

সুখী বাঙালিরা ইংরেজের দৌলতেই সিরাউদ্দৌলার হাত থেকে বেঁচে, তাদের দৌলতেই আধুনিক শিক্ষায় সাফল্যের দ্বারা ভারতে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কুবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে ইংরেজ তাড়াতে মনোনিবেশ করে তার শাস্তি স্বরূপ দেশভাগ ও এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এর পর তাকে আরেক দানব মার্কস গ্রাস করায় সর্বস্ব খুইয়ে এখন প্রায় ভিখারী দশা। কিন্তু এখনো মার্কসবাদ ছাড়তে সে চায় না!

তার এই পরিণতি দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। সীতরাম সম্পূর্ণ বাহুবলে মুসলিমদের পরাভূত করে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেয় এবং প্রবল বেগে এগিয়েও যায়। কিন্তু দুর্বুদ্ধি বশতঃ স্ত্রীলোক দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে (সম্পূর্ণ নিজদোষে) পাঁচ বৎসর রাজকার্য পরিচালনা ত্যাগ করে রাজধর্ম উপেক্ষা করে কর্মচারীদের হাতে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নিজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থেকে সর্বনাশ ডেকে আনে, শুধু স্ত্রীলোকের নিকট বসে পাঁচ বছর নষ্ট করে। সৈন্যেরা বেতন পেত না। রাজস্ব আদায় হোত না। নবাবের খাজনা মুর্শিদাবাদ (দিল্লীর সুলতানের প্রতিনিধি যাঁর কাছ থেকে তিনি সনদ আদায় করেছিলেন)-এ না পাঠিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করে। সমস্ত যোগ্য এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী ও সৈন্যেরা এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ রাজধানী পরিত্যাগ করায় রাজ্য অরাজকতার সম্মুখীন হয় ও অবশেষে বাধ্য হয়ে নবাব তাঁর রাজ্য আক্রমণ ও দখল করে। সীতারাম শেষে পলায়ন করেন তাঁর রাজধানী মহম্মদপুর ত্যাগ করে। সীতারামের অভিভাবক ও পরামর্শদাতা চন্দ্রচূড় বহু চেষ্টা করেও সীতারামের পতন রোধ করতে পারেননি। তাঁর বিশিষ্ট হিতৈষী ফকির চাঁদসাহেবও বিরক্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করে মক্কা চলে যান— যাবার সময় চন্দ্রচূড়কে শুধু বলে যান, "যে দেশে হিন্দু আছে সেখানে বাস করতে নেই। একথা সীতারামই শিখিয়েছে।" অর্জিত সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা কি করে নষ্ট করতে হয় সীতারামই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাঙালি ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়ার্ধ থেকে শুধু তারই সাধনা করেছে। অযোগ্যতা, দলাদলি, দায়িত্ব উপেক্ষা, নিশ্চেষ্ট এবং ধ্বসাত্মক কাজ, "অন্যের দাসত্ব" এই তার পরিচয়। নীরদ চৌধুরী বলেছেন, "যে জিনিস যত সহজ বাঙালি তত তাহা বোঝে না"। সে শুধু মুসলমানদের সপক্ষে যুক্তি সংগ্রহে অত্যুৎসাহী। আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা নাই। কেউ সে চেষ্টা করলে তার মুণ্ডপাত করে।

সুধী, এই অবস্থায় একটা মাত্রই পথ খোলা আছে— বাংলাদেশীদের দ্বারা পরাভূত না হতে হলে এই পথই একমাত্র অবলম্বন।

একদা গান্ধীজী লোকবিনিময় বানচাল করেছিলেন— কিন্তু এখন আমাদের সে চেষ্টাই করতে হবে। এই গান্ধীর প্ররোচনাতেই হিন্দুরা ১৯৪১ সালের সেনসাস বয়কট করে, ফলে দেশভাগের সময় লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুরা কম জমি পায়। আবার তাঁর মিথ্যা ভরসায় বাঙালিরা একযোগে পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করেনি। কেন? গান্ধী জিন্না ও জওহরলাল আশ্বাস দিয়েছিলেন--- দেশভাগের পর আর হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব থাকবে না। তারা নির্ভয়ে পাকিস্তানে থাকতে পারবে। কিন্তু শিখেরা এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করে একযোগে চলে আসে পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে। তাই তাদের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা নেই কিন্তু বাঙালি এখনও একই সমস্যায় ভুগছে।

গান্ধীর খামখেয়ালীর জন্য হিন্দুরা এর আগেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৩০ সালে বৃটিশ Dominion Status দিতে চেয়েছিল। তাহলে ভারত কার্যত স্বাধীন হোত দেশভাগ না করেই। শ্রীঅরবিন্দ ডাঃ আম্বেদকরকে বলেছিলেন এতে বছর কুড়ি বৃটিশের তত্ত্বাবধানে তারা দেশ শাসনে পোক্ত হয়ে উঠলে সহজে স্বাধীনতা দাবী করতে পারবে ও দেশ শাসনে অরাজকতা আসবে না। দাম্ভিক গান্ধী তা মানেননি। এ প্রস্তাব বাতিল করেন। এরপর আবার ১৯৪২-এ স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস্ তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে আসেন। তাতেও দেশভাগ এড়ানোয় জন্য ভারতে মুসলমান প্রধান ও হিন্দু প্রধান স্থানগুলোকে চিহ্নিত করে হিন্দু-মুসলমানকে স্থানান্তর করে প্রদেশভাগ করলে কারও আর অন্যের প্রভুত্বের আশঙ্কা থাকত না— ভারতও ভাগ হোত না। কিন্তু গান্ধী এ প্রস্তাবও নাচক করে বিনা কারণে। আশ্চর্য এই তিনি জিন্না ও গোপালাচারীর সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেন— যাতে ভারত ভাগ হবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং এই প্রস্তাবে গোটা বাংলা ও পাঞ্জাব পাকিস্তানে চলে যাবে। ১৯৪৭-এর প্রাক্কালে শ্যামাপ্রসাদ একক চেষ্টায় মাউন্টব্যাটেনকে বাধ্য করে — যখন দেশভাগ পাকা হয়ে যায়, যাতে এই উভয় প্রদেশই খণ্ডিত হয়। তাই আজ আমরা পশ্চিমবাংলায় বাস করতে পারছি।

কিন্তু ফল হলো গান্ধীর হঠকারিকতায় আজ আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি যে মুসলমানে আজ পশ্চিমবাংলা ছেয়ে গেছে এবং একে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে পরিণত করতে বাংলাদেশ ও আরবের টাকা রয়েছে। সুতরাং পুরাতন কথা ভুলে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে লোকবিনিময় করতেই হবে। কৌশলীরা গান্ধী- জওহরলালের পচা যুক্তি চালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে নির্বিকার হয়ে বিশ্বে এরকম ১০/১২টি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তা নিয়ে এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে শ্রীলঙ্কার তামিলরা রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে তাদের রক্ষাকবচ আদায় করছে। সুতরাং এ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাস্তব সম্মত। কর্তব্যে অবহেলা ও আত্মরক্ষা বিমুখ হয়ে সীতারাম ধ্বংস হয়ে গেল— তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। উল্লেখ্য ১৯৪৩-এ গান্ধী ও রাজাগোপালাচারী লোক বিনিময় প্রস্তাব দেন। বিগত ৭০/৮০ বৎসর যাবৎ লীগ অফ নেশানস ও পরে ইউ এন ও-র তত্ত্বাবধানে সারা পৃথিবীতে ২০টির মতো লোক বিনিময় ঘটেছে। আমরা শুধু দুই বাংলার মধ্যে লোক বিনিময় দাবী করছি। ∎

বঙ্কিম-প্রতিভা

বিপিনচন্দ্র পাল

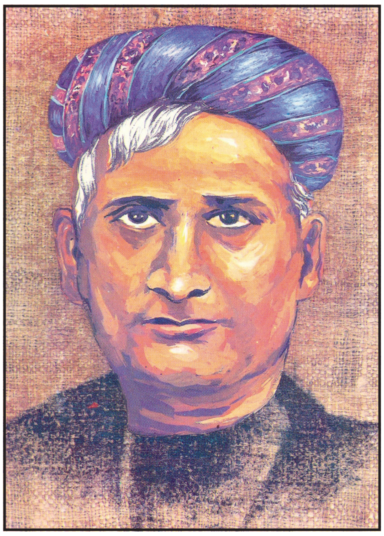

বঙ্কিম সাহিত্য বঙ্কিম চরিত্রের অভিব্যক্তি। ঐ চরিত্রকে যে না বুঝিল, এই সাহিত্যকে কখনই সে সত্য ভাবে বুঝিতে পারিবে না। এই চরিত চিত্রের মূল উপাদান বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন। কিন্তু এ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় নাই। ...এখনও একাজটি কিয়ৎ পরিমাণে সহজসাধ্য আছে, আর কিছুদিন পরে অসাধ্য না হউক, অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।...

পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই দিন দিন ইহা বদলাইয়া গিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর রচনাকালের আর আনন্দমঠের রচনাকালের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর ঘটিয়াছিল। এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আপনি পরিবর্তিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোনওদিন আপনার পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন নাই। কোনওদিন তিনি কালস্রোতের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই। এই জন্যই মৃত্যুদিন পর্যন্ত সত্য সত্যই বাঁচিয়াছিলেন।

তিনি যে বয়ঃক্রম পাইয়াছিলেন, সে বয়সে অনেক লোকই দেখি মরিবার বহুপূর্বেই মৃত হইয়া যায়। সাহিত্য জগতেও এসকল জীবন্মৃতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, অন্ততঃ আধুনিক সময়ে, অতি অল্প লোকই মরণকাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চান্ন বৎসরকাল ইহলোকে ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত, আচারভ্রষ্ট, কর্মবিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীর পক্ষে পঞ্চান্ন বৎসর বাঁচিয়া থাকা নিতান্ত সামান্য কথা নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুদিন পর্যন্ত জীবনের শক্তি ও যৌবনের দীপ্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

জীবন কেবল নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার শক্তিতে। যৌবনকালে নয়, রসানুভূতির সামর্থ্যে। এই দুইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুদিন পর্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এদেশের তিনজন চিন্তানায়ককে এই ভাবে আমরণ বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। দুইজনকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজনের কথা শুনিয়াছি। এক রাজা রামমোহন, দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ ও পার্থক্য ছিল। কিন্তু তিনজনেরই জীবনী শক্তি প্রায় সমানই ছিল। তিনজনই নিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ, নিত্য নূতন আদর্শ আয়ত্ত এবং নিত্য নূতন রস আস্বাদন করিয়াছেন।...

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনী বা মৃণালিনীর স্রষ্টা যে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহাকেই আবার কৃষ্ণচরিত্রের রচয়িতা বা গীতাধর্মের উপদেষ্টা বলিয়া চেনা কঠিন হয়। তাঁর চারিদিকের সামাজিক, মানসিক অবস্থার যেমন পরিবর্তন ও বিকাশ হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৈবী প্রতিভাও তেমনি এসকল পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া, নিত্য নূতন সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জীবন সংগ্রামে জয়শ্রী কেবল সংগ্রামক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী-বল- প্রহরণপটু শক্তিকেই বরণ করে না; দুর্ধর্ষ শক্তির সঙ্গে সুনিপুণ নীতি সেখানে সম্মিলিত হয়, সেইখানেই বিজয়লক্ষ্মী বাঁধা পড়িয়া রহেন। জীবনের সংকেত কেবল প্রতিকূল শক্তির প্রতিরোধের সামর্থ্যেই লুকাইয়া রহে না, সন্ধির কুশলতার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেবল সংগ্রাম করিতেই জানে, সন্ধি করিতে জানে না; যে কেবল অপচয়েরই কারণ হয়, অফুরন্ত উপায়ের পন্থা হইয়া উঠে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবনে এই সন্ধির নিপুণতা, এই সমন্বয়ের সামর্থ্য ছিল; এই শক্তির বলেই তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও তো দীর্ঘকাল কাটিতে চলিল, কিন্তু বঙ্কিমের এই অধিনায়কত্ব এখনও লোপ পায় নাই; অপচিত হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন যেন বাড়িয়াই যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোরতর যুক্তিবাদী ছিলেন। সে যুক্তিবাদেরই যুগ ছিল। ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া ইউরোপের প্রবল যুক্তিবাদকে পরিহার করা কাহারই সাধ্য ছিল না। মহর্ষিপদার্হ দেবেন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই, প্রবক্তা-ধর্মী কেশবচন্দ্র তাহা পারেন নাই, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র যে এ যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।...

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যৌবনে ইউরোপের এই আধুনিক যুক্তিবাদকে আপনার অন্তরে অকুণ্ঠ সহকারে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভয় কাহাকে বলে, বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। "পাছে লোকে কিছু বলে"— এ ভাবনা তাঁর কখনও ছিল বলিয়া বোঝা যায় না। একান্তভাবে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয় না। প্রাচীন লোকমতকে অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা প্রথমে বীরদর্পে স্বাধীনতার নিশান হাতে লইয়া, নূতন সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারাও দুদিন পরে, আপনাদের কর্মের ও ধর্মের— আপনাদের মিশনের খাতিরে, নিজেদের দলের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। সমাজের আনুগত্য ছাড়িয়া অনেক সময়েই ইঁহাদিগকে নিজেদের দলের বা সম্প্রদায়ের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তিত্বাভিমান ও যুক্তিবাদ উভয়েই এখানে শেষে হার মানিয়া যায়। লোকনায়ক হইলেই লোকরঞ্জন করিতে হয়। যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তখনই তাহাকে আর প্রকাশ্যে চিন্তায় ও কর্মে, আচারে ও অনুষ্ঠানে বরণ করা সম্ভব হয় না। নিজের প্রতিপত্তি হানির ভয়ে না হউক, অন্ততঃ লোকহিতার্থায়, ধর্মের খাতিরেই, অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে সংকোচ বোধ হয়।

কেবল যাঁহারা খাঁটি সন্ন্যাসী তাঁহারাই সর্বদা নিজের কাছে খাঁটি থাকিয়া চলিতে পারেন। আর পারেন যাঁহারা খাঁটি কবি। যাঁহারা নিজের রসেই

নিজে ভোর, নিজের সৃষ্টিতেই নিবদ্ধ দৃষ্টি, নিজের সৃষ্টি কলার অনুধ্যানে ও বহিঃপ্রকাশেই যাঁহারা আত্মারাম হইয়া রহেন, যাঁহাদের জীবনের সার্থকতা নিজের তৃপ্তিতে অপরের স্তুতিবাদে নহে, যাঁহাদের কর্মের সাফল্য সেই কর্মেরই মধ্যে আত্মপ্রকাশ হয় তাহাতে, বাহিরের প্রতিপত্তির মধ্যে নয়; সেই সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও, খাঁটি সন্ন্যাসী।

অলৌকিক প্রতিভায় একটা আত্মসম্ভাবিত ভাব সর্বদাই থাকে। ইহা প্রকৃতপক্ষে আত্মসম্ভাবিত ভাবও নহে, কিন্তু অনেক সময় ইহাকে লোকে Self-Conceit বলিয়া ভুল বুঝিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা Self-Conceit নহে, Self-Confidence মাত্র। আপনার উপরে এই নির্ভরতাটুকু, আপনার শক্তিতে এই অটল আস্থাটুকু যাঁহার নাই, তাঁহার কোনও প্রতিভা আছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ইহা অহংকার নহে। প্রতিভা কি করিতে পারে যেমন জানে, কি করিতে পারে না তাহাও তেমনি বুঝে। নিজের সাধ্যাসাধ্যের জ্ঞান সাধারণ লোকের থাকে না, সেইজন্য তাহাদের অহংকারও শোভা পায় না, বিনয়ের কোন দাম হয় না; দুই কল্পিত, মিথ্যাভিমান এবং অলীকাভিনয় মাত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আত্মনির্ভর ও বিজয় দুই-ই খাঁটি বস্তু। সত্য সত্যই এক্ষেত্রে ''উজ্জ্বলে মধুরে'' মিলিয়া যায়, মিশিয়া রহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই Self-Confidence তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার উপযোগী ছিল। এ ব্যক্তি কোনওদিন কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সমাজেরও মুখাপেক্ষী হন নাই, নিজে দল বাঁধিয়া, সেই দলের মতামতের ভিতরেও বাঁধা পড়েন নাই। নিজের মনে যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, নিজের বুদ্ধিতে যাহা যখন সঙ্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই পথেই চলিয়াছেন। আর চলিয়াছেন মানুষের মতন, কৃমির মতো নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর মধ্যে বিস্তর দেখা গিয়াছে; কিন্তু কৃমি-প্রকৃতি-সুলভ বক্রতা ও পিচ্ছিলতা কখনও লক্ষিত হয় নাই। ভিতরে ভিতরে এমন একটা মুক্ত ভাব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এমন করিয়া আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনওদিন চারদিকের চিন্তার ও ভাবনার তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে তৃণের মতো ভাসিয়া চলেন নাই, এই প্রবাহকে ঠেলিয়া তাহার তরঙ্গভঙ্গের উপর উঠিয়া, তাহার মূল গতিকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিয়াই, আপনি নিত্য নূতন রসে, নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য নূতন শক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বসুন্ধরা যেমন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফুটিয়া উঠে, প্রত্যেক ঋতুর বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহাকে নিজের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনে নিয়োগ করে। প্রত্যেক নূতন অবস্থার মধ্যে যাহা গ্রহণীয় তাহাকে গ্রহণ, যাহা বর্জনীয় তাহাকে বর্জন করিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শক্তিতেই আপনার বিকাশের উপযোগী করিয়া তুলে শক্তিশালী মহাপুরুষেরাও নিজ নিজ অধিকারে তাহাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান না, অথবা ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া স্রোতের শক্তি ও সত্যতাকে মায়িক ও অলীক বলিয়াও উড়াইয়া দেন না। কিম্বা তটস্থ হইয়া তাহার চাঞ্চল্যের ও অমঙ্গলের সম্বন্ধে ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করেন না, কিন্তু স্রোতের মাঝখানে যাইয়া, আপনার শক্তি ও নিপুণতার দ্বারা, তাহারই বেগে তাহাকে নিজের সার্থকতা-সাধনে ও জনসমাজের ইষ্টপথে পরিচালিত করেন।

বাঙ্গালা দেশের আধুনিক চিন্তার বিকাশে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরকাল বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদাই এই স্রোতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এই জন্যই আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এমন অনন্য প্রতিযোগী ও সর্বতোমুখী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথের ন্যায় আধুনিক জ্ঞান ও ভাবস্রোতের আগে আগে তাঁহার দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া চলিয়াছেন।...

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের সাহিত্যের সম্রাট, সেই যুগের আদিতেও আজিকালিকার মতো বাঙ্গালা সাহিত্য এতটা পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হয় নাই। আর হয় নাই এই জন্য যে সেকালের বাঙ্গালী লেখকেরা প্রায় সকলেই, আপনাদের সমসাময়িক শিক্ষা ও সাধনার বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি প্রায় সকল অঙ্গকেই স্বল্পাধিক অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গালা শব্দযোজনা আজিকালিকার মতো তখন এত সহজও ছিল না। আর যে সুললিত শব্দযোজনা করিতে পারিত, সে সেই ঝঙ্কার সম্পদের বলে একটা দিগ্‌গজ সাহিত্যিক হইবার উচ্চ আশা লইয়া পাঠক সমাজেও আসিয়া দাঁড়াইত না। এখনকার সাহিত্যিকেরা প্রায় অনেকেই হয় স্বয়ংসিদ্ধ, না হয় কৃপাসিদ্ধ। সাহিত্য সৃষ্টির যে একটা বিশেষ, কঠোর সাধনা আছে, একথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল।... সে সময়ের ইংরজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর মতো আর একটিও পণ্ডিত লোক বাঙ্গালা দেশে ছিলেন বলিয়া জানি না। তাঁর গ্রন্থাবলীর সর্বত্র এই অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ কুত্রাপি যে তিনি নিজের বিদ্যা জাহির করিতে চাহিয়াছেন, ঘুণাক্ষরেও এই সন্দেহটা মনে জাগে না। ...বিদ্যা তাঁর প্রতিভার কিঙ্কর হইয়াই ছিল, তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রভু হয় নাই। বিদ্যা তাঁর যতই বেশী হউক না কেন, প্রতিভা এই বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণ বড় ছিল। আমাদের শিক্ষিত সমাজ আজিকাল কালচারের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে কোলাহলায়িতও হইয়া উঠে। 'বঙ্কিম মণ্ডলে' এ স্ফীত মস্তকের বা কোলাহলের উৎপাত দেখা যায় নাই; অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের যে পড়াশুনা ছিল, এখন তার কিছুই নাই বলিলেই চলে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা পড়িতেন, তাঁর আলোকসামান্য প্রতিভা তাহা একেবারে হজম করিতে পারিত। অধীত বিদ্যাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। পরের বস্তু তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই হইয়া, তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারে তাঁর নিজের মোহরাঙ্কিত হইয়া সঞ্চিত হইত।...

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোন্ তত্ত্বটা জানিতেন না, এ দেশের বা ইউরোপের কোন্ লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এ দেশের বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মন্বাদি স্মৃতি, সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ, এ সকলের সঙ্গে যে তাঁর কতটা পরিচয় ছিল, তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধাবলীতে, কৃষ্ণ চরিত্রে, গীতাভাষ্যে ইহার বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক ক্যান্ট, হেগেল, কুজো, কোমটে এবং ইংরাজ চিন্তানায়ক স্পেন্সার, মিল্, বেন্থাম, হকস্‌লি, টিণ্ডেল, ক্রেভরিক হ্যারিসন প্রভৃতি ও আর এক দিকে মেথু আরনল্ড, রেনাঁ প্রভৃতি এমনকি প্রত্নতত্ত্ব বা spiritualism এবং মেসমেরিজম্ (mesmerism) পর্যন্ত তাঁর কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল, এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একটুও অপপ্রয়োগ বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে কত বড় ছিল, ইহাতেই আমরা তাহার একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। ■

(স্বস্তিকা, পুজো সংখ্যা ১৩৮৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ

অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গটি আলোচনার আগে আমাদের দুটি জিনিস জেনে নিতে হবে। এক জাতীয়তাবাদ কি? দুই বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ পরিবেশে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন। প্রথমটি অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ নিয়ে নানা মহলে নানা মত প্রচলিত। কেউ বলেন জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ মনের মতবাদ, কেউ বলেন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় এই জাতীয়তাবাদ। এসব নানামতের মধ্য থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদকে তুলে নিতে হলে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিতে হয়। তিনি বলেছেন— বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ছিল— স্বদেশকে ভালবাসা। স্বদেশের মানুষের সঙ্গে সাজাত্যবোধ। স্বদেশের মাটি জলবায়ু, স্বদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি, স্বদেশের বীরত্ব এসবগুলির সঙ্গে যাঁর যতটা একাত্মবোধ তিনি ততটাই জাতীয়তাবাদী।

ইংরাজীতে যাকে বলে প্যাট্রিয়াটিজম, জাতীয়তাবাদ তার থেকে পৃথক। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্যাট্রিয়াটিজমকে ঘৃণা করতেন। ন্যাশনালিজম বললে কিছুটা কাছাকাছি আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন যুবক। তখনকার রীতি অনুযায়ী তিনি একজন ইংরাজী শিক্ষায় সফল পুরুষ। অতি সহজেই তিনি সেই শিক্ষা অবলম্বন করে মানুষের প্রার্থিত যা কিছু তা পেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সাধনা হলো স্বদেশের স্বজাতির ভাষা অর্থাৎ বাংলার ভাষার উন্নতি সাধন। এই লক্ষ্যে একনিষ্ঠ থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশ। তারপর সে ভাষাতেই উপন্যাস সৃষ্টি, যা তাঁর আগে বাংলা ভাষায় ছিল না। সমাজের কলুষিত আচরণগুলিকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে তার সংস্কার সাধনের বিশেষ প্রয়াস চলল তার সঙ্গে। এই একই পথে নূতন রূপে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের নূতন উপস্থাপন।

বঙ্কিমচন্দ্রের একনিষ্ঠ সাধনা এবং লোকোত্তর প্রতিভা বলে বাংলাভাষা কিছু পরিমাণে লোকমান্য হলেও প্রথমদিকে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালি এবং সংস্কৃত পণ্ডিত বাঙালী এই উভয় শ্রেণীর বাংলা ভাষাকে ঘৃণাই করত। স্বদেশ প্রীতি স্বাজাত্যবোধ। স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা জাতীয়তাবাদের সেই পরিমণ্ডলে আজীবন বিচরণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

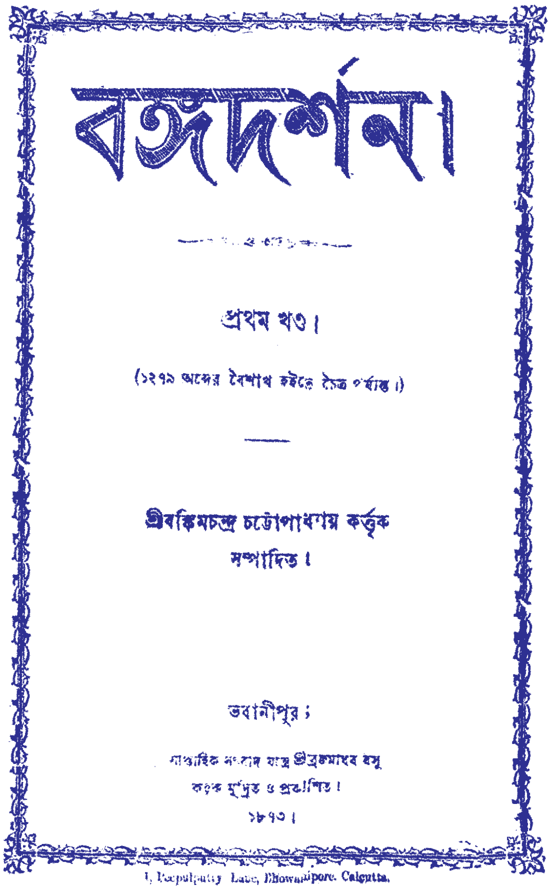

বঙ্গদর্শন।

প্রথম খণ্ড।

(১২৭৯ অব্দের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৩।

1, Pepulpatty Lane, Bhowanipore, Calcutta.

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। বাঙালিকে পাশ্চাত্যাকার চিন্তাধারার প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য বাঙালির হিন্দুর আহার-বিহারসহ সমূহ প্রাচীন রীতিনীতি অবলম্বন করে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামে পুস্তিকাও প্রকাশ করেন তিনি। উপসংহারে বলেন— 'হিন্দুজাতির গরিমা বিশ্বময় বিস্তারিত হচ্ছে।' তাঁর যে কোনও বক্তব্যের উপর বক্তৃতার শেষে গান গাইতেন—

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ ইত্যাদি।

কেবল বাংলা নয় সমগ্র ভারতে জাতীয়তাবাদের এমন আহ্বান রাজনারায়ণের পূর্বে আর কেউ করেনি।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বঙ্গদর্শনে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা প্রবর্তন করেন। এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু যে একটি পৃথক জাতি তা জানানো। হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়ভাব প্রসারের জন্য রাজনারায়ণ ও নবগোপাল মিত্রের একান্ত প্রচেষ্টা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।' কিন্তু তথাপি তিনি অন্যভাবে এই মতকেই সমর্থন করেছেন। বলেছেন---''স্বজাতি প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক যে জাতির মধ্যে ইহা ফলবতী হয় সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে।''

রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদের নিন্দা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু 'বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হউক' এই প্রার্থনা কিন্তু পরোক্ষে বঙ্কিম জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থন করে।

একদিকে রামমোহন প্রবর্তিত স্বশাসনের জন্য অনুরোধ-উপরোধ, অন্য দিকে কেবল হিন্দু জাতির জাগৃতির আহ্বান। ১৮৭৬-এ শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ীতে অগ্নি সাক্ষী করে বিপ্লবের শপথ গ্রহণ, এই অস্থির পরিবেশে কমলাকান্ত রূপী বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে দুর্গা রূপে পূজা করে

দুর্গোৎসব করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ-কর্ষিত বোধের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে মা রূপে দৃষ্ট হলেন। প্রায় সেই সঙ্গে স্বদেশমন্ত্র উচ্চারিত হলো 'বন্দেমাতরম।'

১৮৮২ সালে প্রকাশিত হলো আনন্দমঠ। এই আনন্দমঠই বঙ্কিম জাতীয়তাবাদের বাঙ্ময় রূপ। নাম আনন্দমঠ, কিন্তু তথাকথিত আনন্দের উপকরণ এতে নাই। প্রধান চরিত্র দেশমাতা কিন্তু তার কোন ক্রিয়া নাই। অন্যান্য চরিত্রের পৃথক পৃথক নাম আছে। কিন্তু সবাই একই চরিত্রের

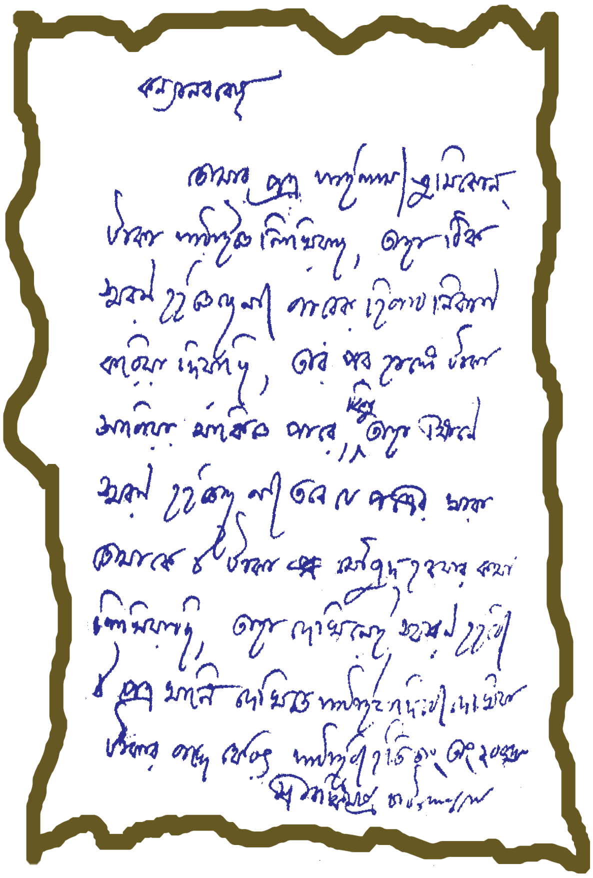

অন্তর্ভুক্ত—সন্তান। যাদের দ্বারা মা লাঞ্ছিতা হন তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান সব যুগে সব সন্তানের প্রথম কর্তব্য। এখানে ধর্ম জাতি শ্রেণী উচ্চ নীচ ভেদ নাই। এই অর্থে আনন্দমঠ তথা বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ সাময়িক কালের নয়, অক্ষয় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্তানের প্রত্যেকটি কর্মের লক্ষ্য হবে মায়ের সেবা, অজস্র যন্ত্রণার মধ্যেও মায়ের সেবার কৃতকৃত্যতায় আসবে অলৌকিক আনন্দ। দুঃখ ও ব্যর্থতার কলঙ্ক মাথায় নিয়েও সন্তান দলের আশ্রয় এই আনন্দমঠ। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলো। একদল রাজনীতিক চাইলেন মুসলমানও একই সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিক। তাঁরা প্রচার করলেন, মুসলমানও এই দেশেরই মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতেন সুজন-দুর্জন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। সুজনকে সম্পাদিত করে দুর্জনকে পরিহার করতেই হবে। কিন্তু যদি কোনও সম্প্রদায় বহু অতীতের স্মৃতি স্মরণে রেখে বিজিত ও বিজেতার ভেদ রেখা তৈরি করে তার পক্ষে এদেশকে মা বলে ভাবা সম্ভব নয়। এর মধ্যে কোনও ধর্মাধর্ম নাই। কারণ মানুষ মাত্রেরই জন্মভূমি আছে যে ভূমিতে থেকে প্রকৃতির জল হাওয়া ভোগ করে বড় হয় সেই তো মা। সমগ্র বন্দেমাতরম সঙ্গীতটিতে যে বর্ণনা আছে তাতে হিন্দুর পৌরাণিক কোনও দেবদেবীর বর্ণনা নাই। জন্মভূমির ভৌগোলিক নিখুঁত বর্ণনা। আর আছে সেই দেশের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই স্বপ্নের মানুষ যাদের বীরত্বে মায়ের বন্ধন দশা টুটে যাবে। একেই কাজে লাগিয়েছে কিছু স্বার্থান্বেষী মুসলমান। তাদের মতে এ উদাহরণ তাদের ধর্মের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের উদাহরণ তুলে ধরে প্রচার করা হতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানবিদ্বেষী অর্থাৎ তাঁর জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য নয়। প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত রেজাউল করিম সাহেবের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি লিখেছেন— বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন চরিত্রের মুখ হইতে মুসলমান সম্বন্ধে কতকগুলি অশোভন কথা উচ্চারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা যে বঙ্কিমেরই কথা এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আনন্দমঠের এক স্থানে সত্যানন্দ বলিতেছেন ''এ বাবুয়ের বাসা শূয়োরের খোঁয়াড় ভাঙিয়া ফেল। অনেকে মনে করেন মুসলমানকে ধ্বংস করিয়া হিন্দুরাজ স্থাপনের জন্য প্রেরণা দিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল। বঙ্কিমের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে চরিত্রের মুখে যে কথা সাজে তিনি অপূর্ব পটভূমিকায় তাহার মুখে ঠিক সেই কথাই বসাইয়াছেন।''

যে যুগের কথা লইয়া আনন্দমঠ রচিত সেই যুগের রাজনৈতিক অবস্থাটি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন! গুলিখোর মীরজাফর রাজ্যশাসনে উদাসীন, ঘুষখোর সেতাব রায় ও রেজাখাঁ প্রজাপীড়নে রত। আর বিদেশী বণিক দেশ লুণ্ঠনে ব্যস্ত। এই অবস্থার অবসান করিবার জন্য সন্তান দল সমগ্র জীবন পণ করিয়াছে। তাঁদের নেতা সত্যানন্দ এহেন রাজ্যকে 'শূকরের খোঁয়াড়' ও 'বাবুয়ের বাসা' বলিবেন না তো কি বলিবেন?

স্বার্থান্বেষী যারা তারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সুবিধামতো উপায় অবলম্বন করে। তাদেরই অপপ্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী, তাদেরই অপপ্রচারে বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ কেবলই হিন্দুত্ববাদ। স্বদেশ প্রীতি ও স্বদেশ সাধনা যাঁর একমাত্র সাধন তিনি আজ সংকীর্ণতাবাদী আখ্যায় আখ্যাত। এরই মধ্যে যাঁরা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রচারক তাঁরা নিজেদের উদারমনস্কতার জন্য গর্ববোধ করতে পারেন, কিন্তু তাঁদেরও জানা উচিত বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের ভূমিতে দৃঢ়ভাবে না দাঁড়াতে পারলে আস্ত জাতীয়তাবাদ উপহাসের মতো শোনাবে। ■

তথ্য সূত্র :

প্রবাসী—১৩৪৭ শ্রাবণ

ভারতবর্ষ—১৩৬৯ (বাঁধাই)

শনিবারের চিঠি—১৩৫১ (ঐ)

বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র মনীষী ও মানুষ—অভয়চরণ দে

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ভূদেব চৌধুরী

সনাতন ও হিন্দু দর্শনের প্রেমিক

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-ভাবনা

ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ধারক ও সাহিত্য গবেষক অচ্যুত গোস্বামীর মতো সমালোচকরা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে সামন্ততন্ত্রের প্রভু বলে চিহ্নিত করে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্ভারকে সাম্প্রদায়িক ও সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে কলঙ্কিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রই বঙ্কিমচন্দ্রকে রাষ্ট্র ভাবনা, জাতীয় ভাবনা ও অধ্যাত্ম ভাবনার সমন্বয়ে গড়া মানসিকতার শরিক হিসাবে আখ্যা দিয়ে বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। এই চারটি ভাগ হলো— প্রথমত, সমাজবাদী মানব প্রেমী সাহিত্য, দ্বিতীয়ত, স্বদেশ উদ্দীপক জাতীয় সচেতন আদর্শবাদী সাহিত্য, তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক সাহিত্য, চতুর্থত, চরিত সাহিত্য। 'কপালকুণ্ডলা' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ' ইত্যাদি গ্রন্থকে সামাজিক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলার ও বাঙালির সমাজ জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যে স্বদেশ-উদ্দীপক জীবন ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্র ও ধর্মকে একাকার করেছেন লেখক। এইসব গ্রন্থে ধর্ম ও রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ধ্বনি সৃষ্টি করে মা-কে বন্দনা করার মাধ্যমে জাতীয় ভাবনা ও অধ্যাত্ম ভাবনাকে সম্মিলিত করে দেশ-মাকে দিয়েছেন জীবন্ত রূপ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহে জাতীয়তার বীজ বুনে দেশাত্মবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জগতের দ্বিতীয় স্তরে স্বদেশ ভাবনা এক নতুন আদর্শবোধের জন্ম দিয়েছে।

ইতিহাস আশ্রিত চরিত্র এবং আদর্শবোধের বীজ বুনে তৃতীয় স্তরে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মুখবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি, হিন্দুর বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়।' রাজসিংহ উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিমের উপরোক্ত বক্তব্য হিন্দুর বাহুবলকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়ে হিন্দু ধর্মকে বিশেষ শক্তিশালী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি লেখকের আকর্ষণকে কম্যুনিস্ট চেতনার ধারকগণ সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত করে লেখককে এক পাশে ঠেলে দিয়েছেন। লেখকের গীতার নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব, মিলের মানবতাবোধ, ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের সাম্য চিন্তার দর্শনকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

বঙ্কিমের মানব প্রেমিক রূপকে তাঁরা দেখতে চাননি, তাই তাঁদের সমালোচনায় বঙ্কিমের প্রকৃত সত্য রূপটি ধরা পড়েনি। স্বদেশ প্রেম, মানবতা, অধ্যাত্মভাবনা ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে যে একাকার হয়ে গিয়েছে তা কম্যুনিস্ট ধারকরা লক্ষ্য করেননি। বঙ্কিমের

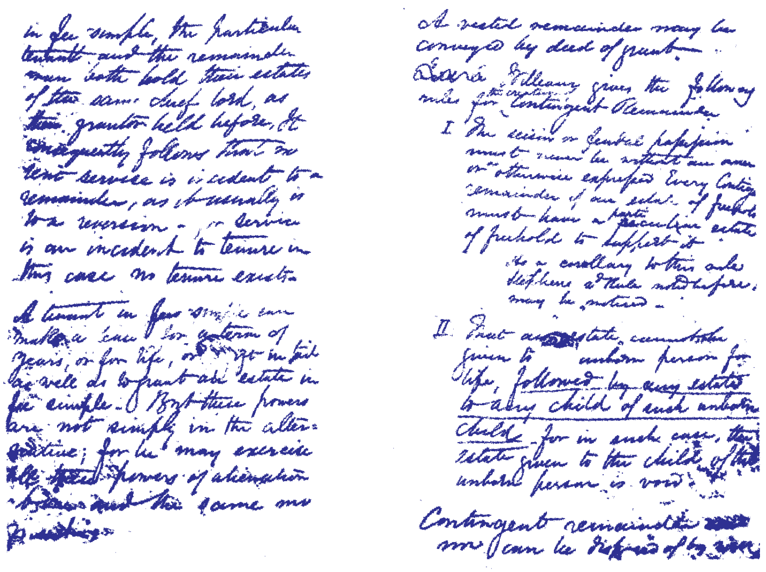

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে লেখা সিভিল আইনের নোটবুক-এর দুটি পৃষ্ঠা

বঙ্কিমচন্দ্র

(সনেট)

প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্ন ত্রিযাম গভীর
ধ্বনিল গম্ভীর মন্দ্রে "বন্দেমাতরম্",
জ্যোতির্ময় অগ্নিস্তোত্র আশ্চর্যপরম,
সঞ্চারিয়া ত্রস্ত প্রাণে শৌর্যদধীচির।
সে কথা রচিলে ঋষি, প্রবুদ্ধধ্যানীর
নয়নে হেরিয়া আহা দেশের চরম
বেদনাবিধুর রিক্ত বিক্ষত মরম,
সে সব অমূল্য নিধি বঙ্গজননীর।
ভুলিল কি বঙ্গভূমি হিমাদ্রি মহিমা
সঞ্জীবনী সুধামাখা বঙ্কিমের নাম
কৃষ্ণ চরিত্রের সেই বিচিত্র ব্যাখ্যান?
এ জাতির লাঞ্ছনার নাহি পরিসীমা
হতমান দেশ আজ ওগো পুণ্যধাম,
তোমার বিপুল বীর্য করিছে আহ্বান।

প্রতি বিরূপ ধারণায় তাঁরা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁরা বঙ্কিমের প্রতি ন্যায় বিচার করেননি। 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনায় সাম্যবাদী বঙ্কিমকে তাঁরা চেনেননি। এমনকি তাঁর সৃষ্ট প্রসন্ন গোয়ালিনীর চরিত্র সৃষ্টিকে তাঁরা মূল্য দেননি।

আমার মন, একা, কে গায় ওই, বিজ্ঞান ইত্যাদি রচনায় যে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বঙ্কিমকে প্রত্যক্ষ করা যায় তা তাঁরা খুঁজে পাননি— ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাসী ও ঋষি বঙ্কিমকে তাঁরা চিনতে পারেননি। বস্তুত বঙ্কিমের প্রতি ন্যায্য বিচার তাঁরা করেননি। গীতার নিষ্কাম প্রেম তত্ত্ব, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য চিন্তা, মিলের মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্যের বুকে বঙ্কিম যে শক্তিশালী বীজ বুনেছিলেন তা নস্যাৎ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমই প্রথম ভারতীয় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলা সাহিত্যে রাষ্ট্র, ধর্ম অধ্যাত্মবোধ সম্বলিত চেতনাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। মা কি ছিলেন, মা কি হয়েছেন, মা কি হবেন— মাতৃভাবনার এই তিন রূপকে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আলোকে দেশমাতৃকাকে মিশ্রণ করে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। 'আনন্দমঠ-এ' বঙ্কিম ধর্ম চেতনাকে রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গে সমন্বিত করে সমগ্র ভারতীয় ভাবনাকে জাতীয় ভাবনার রসে জারিত করেছেন। বঙ্কিমের সৃষ্ট 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম তত্ত্বের সঙ্গে রাষ্ট্র বা জাতীয়ভাবনার সমন্বয় ঘটিয়েছে। দশপ্রহরিণী দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার সঙ্গে ভারতমায়ের মূর্তি একাকার হয়ে গেছে সন্ন্যাস বিদ্রোহের মাধ্যমে। ১৮৭৬-এর দুর্ভিক্ষ সারা দেশের মানুষের জীবনকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড় করিয়েছিল, তারই প্রেক্ষাপটে সন্ন্যাসী ভবানন্দের ভাবাদর্শে যে দেশপ্রেমের বীজ বুনেছিলেন সেই দেশপ্রেম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে মহাবিদ্রোহের মন্ত্রধ্বনি সৃষ্টি করেছিল। তাই বন্দেমাতরম্ মন্ত্র বিপ্লবীদের কণ্ঠে পরাধীনতার শিকল ছেঁড়ার মহামন্ত্র রূপে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। আর এরই পরিণতিতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের ঋষি বঙ্কিমে উত্তরণ ঘটেছিল। জাতীয়তাবাদীদের কাছে তিনি সনাতনী চেতনার ধারক ও বাহক। বিপ্লবীদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমিক ও পথপ্রদর্শক।

তাঁর অনুপ্রেরণায় শত শত শহীদ্ জীবনকে পায়ের ভৃত্য করে দেশমায়ের চরণতলে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। এখানেই বঙ্কিমের সৃষ্টির মহত্ত্ব। আজও বঙ্কিমের মহামন্ত্র ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্' জাতীয়তাবাদীর চলার পথের পাথেয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম জাতিকে মন্ত্রপূত করে সনাতনী আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন। তাই তিনি একদিকে সাহিত্যিক অন্যদিকে ঋষি ও দেশপ্রেমিক। ভারতবর্ষের মানুষ বিদেশীর শাসন ও শোষণ তন্ত্রের শিকল ছেঁড়ার জন্য যে সংগ্রামী মন্ত্র নিয়েছিলেন তা বঙ্কিমের কাছে থেকে নেওয়া। তাই একমাত্র কম্যুনিস্ট ছাড়া প্রত্যেক ভারতীয় বঙ্কিমের আত্মার আত্মীয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক ভারতীয়ের আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত। যতদিন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার মন্ত্রধ্বনি শোনা যাবে ততদিন বঙ্কিম-আত্মা ভারতের বুকে জীয়নকাঠির স্পর্শ দিয়ে বলবে— 'বন্দেমাতরম্'; ওঠ, মাকে বন্দনা কর। ■

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী।

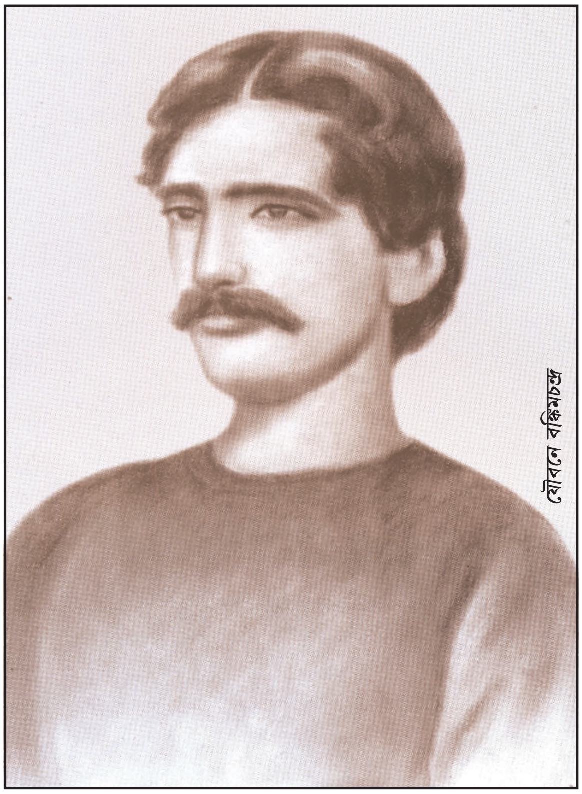

যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরম্

একটি সমীক্ষা

উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋষি অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম ঋষির সম্মান দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম্ স্তোত্র দর্শনের জন্য। অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই স্তোত্রটি শাসকদলের বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে ভারতের জাতীয়সঙ্গীত হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, যেমন ভাবে সংস্কৃত ভাষা গণপরিষদে হিন্দির কাছে এক ভোটে হেরে জাতীয় ভাষার সম্মান হারিয়েছিল। যে বঙ্কিমের হাত ধরে জাতীয়তাবাদের উত্থান অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল তাঁর মাতৃমন্ত্রটির অতি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত হিসাবে আনন্দমঠ উপন্যাসের অংশ রূপে প্রথম মুদ্রিত হলেও, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশের আগেই সম্ভবত ১৭৭৫-৭৬ সালের কোনও সময়ে এটি লিখিত হয়। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, বঙ্গদর্শনের দুই এক পাতা matter কম পড়লে কাঁঠালপাড়ার পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে পাতার ওই অংশ পূরণ করার কথা জানাতেন এবং বঙ্কিমও সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা লিখে দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের উপযোগী করে তুলতেন। একবার পণ্ডিতমশাই এমনি এক প্রয়োজনে বঙ্কিমের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর টেবিলের উপর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি দেখে বলেছিলেন— 'উহা মন্দ নয়তো— এটা দিন না কেন?' অভিমানী বঙ্কিম লেখাটা টেবিলের দেরাজের মধ্যে তুলে রাখতে রাখতে বললেন— 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে— আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার'।

বঙ্কিমের বড় মেয়ে একবার বন্দেমাতরম্ নিয়ে নানা স্থানে সমালোচনা হতে দেখে বাবাকে জানালেন যে— লোকে গানটি তেমন পছন্দ করে না। এর উত্তরে সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিম জানিয়েছিলেন— একদিন এই গান নিয়ে সমস্ত বাংলা ও বাঙ্গালী উত্তাল হয়ে পড়বে। সেদিন বঙ্কিমের চিন্তা কত সঠিক ছিল সেটা বোঝা যায় বাংলা তথা ভারতকে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে উত্তাল হতে দেখে।

বন্দেমাতরম্ রচনার একটা মানসিক প্রস্তুতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে অনেকদিন আগে থেকেই কাজ করছিল। অন্ততপক্ষে কমলাকান্তের দপ্তর রচনার আগে থেকে সেই প্রচেষ্টা চলেছে। কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বঙ্গদর্শনের সপ্তমবর্ষে ১২৮৭ সালের চৈত্র সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে আনন্দমঠ উপন্যাস প্রকাশ পেতে থাকে। সেই সংখ্যাতেই উপন্যাসের সন্ন্যাসী চরিত্র ভবানন্দের কণ্ঠে গানটি বসানো হয়। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাসটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বঙ্গদর্শনে বন্দেমাতরম্ গানটি যেভাবে সাজানো হয়েছে পরবর্তী গ্রন্থ সংস্করণে তার পঙ্ক্তি সাজানোর ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। ঔপন্যাসিক ঘটনাকে বীরভূমে এনে ফেলেন। চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত তা থাকলেও পঞ্চম সংস্করণে সেটি বাংলায় নিয়ে আসা হয়েছে। এখানকার সন্ন্যাসীদের বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়কদের মধ্যে ছিল কিনা সেটা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বঙ্কিমের সন্ন্যাসীরা কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ। বর্তমানে গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের জীবনকথা আনন্দমঠের প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন নাকি বঙ্কিমকে দেশপ্রেমমূলক একটা উপন্যাস লিখতে বলেছিলেন এবং সেই অনুরোধেই এটি লিখিত হয়।

আনন্দমঠের অংশ হিসাবে বন্দেমাতরম্ প্রকাশিত হলেও এটি কিন্তু পৃথক ভাবে লেখা একটা দেশাত্মমূলক সঙ্গীত। বঙ্কিমের ভাটপাড়া বাসের সময় বিখ্যাত গায়ক যদুনাথ ভট্টাচার্য এই গানে সুরারোপ করে গেয়েছিলেন। ইনিই পরবর্তীকালের বাংলার এবং ঠাকুর পরিবারে যদুভট্ট নামে উল্লিখিত। যদুভট্টেরও আগে এই গানটিতে সুর দেবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেই সুর বঙ্কিমের পছন্দ হয়নি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই সঙ্গীতে সুরারোপ করে বঙ্কিমের সামনেই গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সমগ্র সংগীতে অবশ্য সুরারোপ করেননি, প্রথম ৭টি পংক্তিতে সুর দিয়েছিলেন। স্বরবিতানে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সেই সুরটি ধরা আছে। ১৮৯৬ সালে যখন কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন সেই সুরেই কবিগুরু সেখানে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ২৪ বছর তখন থেকেই ঠাকুরবাড়ীর

সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পাদনায় (১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে) বালক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হোত। মূলতঃ শিশুদের জন্যই ঠাকুরবাড়ীর এই পত্রিকাটি নির্দিষ্ট ছিল। পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় 'গান অভ্যাস' বিভাগে হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাসুন্দরী দেবীর নামে দুটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল বন্দেমাতরম্ এর প্রথম ৭টি পঙ্ক্তির স্বরলিপি। সমগ্র গানটির স্বরলিপি না দেবার কারণ সম্পর্কে প্রতিভাদেবী জানিয়েছেন যে গানটির সুর খুব কঠিন হবার জন্য সমস্তটার সুর দিলে পাঠকের পক্ষে সেটা করা আরও কঠিন হতে পারে বলে পংক্তি পর্যন্ত দেওয়া গেল। এখানে গানটির রাগিণী দেখান হয়েছে দেশ এবং তাল দেখানো হয়েছে কাওয়ালি। সরলা দেবীর শতগান নামক গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ১৩০৭ বৈশাখ) পূর্বোক্ত সঙ্গীতটির রাগিণী দেশ হলেও তাল হলো একতালা। এখানে সুরকার হিসাবে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। বালক পত্রিকায় প্রকাশিত বন্দেমাতরম্ এর স্বরলিপি এবং শতগানে প্রকাশিত এই গানের স্বরলিপির মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকলেও উভয় গানের সুরকার হিসাবে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের কথাই বলেছেন তাঁর 'ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বালক পত্রিকায় প্রকাশিত গানটির সঙ্গে একপাতা জুড়ে হরিচন্দ্রের আঁকা ভারতমাতার একটি ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল। এই জননী তাঁর সন্তানসন্ততিতে পরিবৃতা হয়ে আছেন। মূর্তিটিতে কোথাও দেবীভাব প্রকাশিত হয়নি।

আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম্-এর প্রথম দুটি পদে সুর দিয়েছিলেন এবং তখনকার দিনে সভাসমিতিতে এই পর্যন্ত গাওয়া হোত। পরবর্তীকালে 'সপ্তকোটি কলকলকণ্ঠ' থেকে গানের অবশিষ্ট অংশের সুর দেবার জন্য কবিগুরু সরলা দেবীকে বললেন। আগের অংশের সঙ্গে সুরের সমন্বয় যাতে থাকে সেভাবেই সমগ্র গানটিতে সুরারোপ করে সরলাদেবী কবিকে শুনিয়েছিলেন। সুর শুনে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হন। এর পর থেকেই বিভিন্ন স্থানে সমগ্র গানটি গাওয়ার প্রচলন হয়।

বঙ্কিম যখন বন্দেমাতরম্ লিখেছিলেন তখন স্বাদেশিকতা বোধ সেভাবে উপ্ত হয়নি। স্বাদেশিকতার জাগরণ মূলত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই দানা বাঁধতে থাকে। বাঙ্গালীর ঐক্যকে এবং সংগ্রামী চেতনাকে নষ্ট করার জন্যই লর্ড কার্জন বাংলাকে টুকরো করে বিহার ও আসামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে দেশকে সঙ্কটের পথে ঠেলে দেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল বারাণসীতে। এর আগে থেকেই বন্দেমাতরম্ যেন বিপ্লবের প্রতিধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাংলার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে কোথাও কোথাও সভাসমিতিতে বন্দেমাতরম্ গাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল।

সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি আসমুদ্র-হিমাচল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার একটা ইতিহাস দিয়েছেন। তিনি যখন মৈমনসিংহে সভা উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন সেখানকার সুহৃদ্ সমিতির সদস্যরা স্টেশন থেকে তাঁকে সভাস্থল পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য বিপুলভাবে সমবেত হয়েছিলেন। তখন সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে তারা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। সেখান থেকে সারা বাংলায় গানটি ছড়িয়ে পড়ল। পূর্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনকারীদের উপরে অত্যাচার যতই বাড়তে থাকল ততই গানটির ব্যাপ্তি ঘটতে থাকল।

বঙ্গভঙ্গের সময় পর্যন্ত কংগ্রেসের ভার ছিল নরমপন্থীদের হাতে। তারা সরকারবিরোধী মারাত্মক কোনও পদক্ষেপ নিতে চায়নি। ফলে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা নিষিদ্ধ বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতকে তারা পাদপ্রদীপের সামনে আনতে চাননি। তখন কংগ্রেসের একটা মহিলা বাহিনীও ছিল। এর মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর সরলা দেবী, জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী লেডি অবলা বসু এবং আরও অনেকেই ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে ১৯০৫ সালে যখন কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশন চলছে, তখন সভার মধ্যে থেকে সভাপতির কাছে অনুরোধ গেল বন্দেমাতরম্ গাওয়াবার জন্য। সরকার অসন্তুষ্ট হবে জেনেও সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদের একান্ত বাসনাকে বিমুখ করতে পারলেন না সভাপতি। ফলে দোতলায় মেয়েদের সারিতে বসে থাকা সরলা দেবীর কাছে গোখেলের চিরকূট গেল সংক্ষেপে গানটি গাওয়ার জন্য। সুদীর্ঘ গানের কতটুকু অংশ গাইতে হবে সেকথা পত্রে ছিল না। ফলে গায়িকা সেদিন সংক্ষিপ্ত ভাবেই গানটি গেয়েছিলেন।

সেদিনের গায়িকা জ্ঞাতসারেই গানটির একটি অংশের পাঠান্তর ঘটিয়েছিলেন। বঙ্কিমের কথায় ছিল 'সপ্তকোটিকণ্ঠে কলকল নিনাদ' ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা তখন অনেক বেড়ে গেছে। তাই সরলাদেবী পূর্বোক্ত পাঠকে পরিবর্তিত করলেন 'ত্রিংশকোটি'তে। দেশ ভক্তদের কানে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সেদিন মধুবর্ষণ করলেও পদের পরিবর্তন ঘটানোয় বিশাল কোনও বিতর্কের ঝড় উঠেছিল বলে জানা যায় না।

সংস্কৃতকে সর্বভারতীয় স্তরে জাতীয় ভাষা করলে দক্ষিণীদের বিশেষ আপত্তি ছিল না, যদিও তাদের ভাষা সরাসরি সংস্কৃত উৎসজাত নয়। অনেক সংস্কৃত শব্দকে দক্ষিণীভাষা আত্মসাৎ করেছিল। পক্ষান্তরে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ভাষাগুলি হয় সংস্কৃত থেকে সরাসরি সৃষ্ট অথবা একটু আধটু বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট। সংস্কৃতের তৎসম শব্দ সমস্ত ভাষাকেই সমৃদ্ধ করেছে। এমতাবস্থায় ভারতের জাতীয়ভাষা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের একটা বিশেষ ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। একইভাবে আমাদের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত শাস্ত্র-কাব্যাদির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিম অনেক ভেবেচিন্তে বন্দেমাতরম্ লিখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সমকালে বাঙ্গালীর ঐক্যকে কেন্দ্র করে যেহেতু এক বিশাল নবজাগরণ হয়েছিল, তাই তখনকার সঙ্গীতে বঙ্গমাতার রূপটি অনেক সময় ফুটে উঠতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি ভারতমাতার বন্দনাত্মক কবিতাও কম লেখা হয়নি। সেই সময়ে এবং পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে যত দেশ বন্দনাত্মক গান লেখা হয়েছিল স্বাধীনতা উত্তরকালে হঠাৎ সেই ধারা শ্লথ হলো কেন? অথর্ববেদের ভূমিসূক্ত থেকেই তো সংস্কৃত ভাষায় দেশবন্দনা রচনার ইতিহাস আমাদের ঐতিহ্য। এই বৈদিক ঐতিহ্যের কথা বঙ্কিম জানতেন না একথা ঠিক কিন্তু পরবর্তীকালে বেদের দ্যাবাপৃথিবী সূক্তের ব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন এবং ধর্মতত্ত্বে সেই বিষয়ে আলোচনাও করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে বঙ্গে বেদচর্চার স্বল্পতার জন্য ঊনিশ শতকের অনেকেই তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বৈদিক তত্ত্বের উল্লেখ করেননি। সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণেও দেশভাবনার ধারা ম্লান হয়নি। সেই ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য বলে আমরা এই আলোচনার বিস্তৃতিতে গেলাম না।

রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটির পটভূমিকায় আছে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত। এই গানটিই পরে সংবিধান অনুসারে আমাদের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। এই পর্বে সরলা দেবী এবং আরও অনেকে দেশাত্মবোধক উৎকৃষ্ট গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু এইসব গানের জনপ্রিয়তা বন্দেমাতরম্-এর কাছাকাছি ছিল না। বন্দেমাতরম্ গানের সংস্কৃতভাষা আর মাতৃবন্দনা কোনও কোনও মহলে বিরূপ মনোভাব জাগাচ্ছে সেকথা কংগ্রেসের নেতারা বুঝেছিলেন। অথচ ভারতের সীমা পেরিয়ে সর্বভারতীয় আন্দোলনের স্তরে বন্দেমাতরম্ যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাকে অস্বীকার করাও সেদিনকার নেতাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের অস্বস্তিবোধটি ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন থেকেই দেখা যায়। তিন দিন ধরে কংগ্রেসের এই অধিবেশন হয় এবং প্রত্যেকদিন অধিবেশনের প্রথমে নতুন নতুন গান গাওয়া হয়েছে। প্রথমদিন গাওয়া হয় বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্', দ্বিতীয় দিন রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' এবং তৃতীয় দিন সরলা দেবীর 'গাহ আজি হিন্দুস্থান'।

বন্দেমাতরম্ সম্পর্কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বিরুদ্ধ মনোভাব থাকলেও তাঁদের মধ্যে একটা প্রগতিশীল গোষ্ঠী এটির সমর্থকও ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই গানের উপর কোনও ভাবেই সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁরা জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে কোনও হিন্দুস্থানী গান চাইছিলেন। এই ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ মতামতও উপেক্ষিত হচ্ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ঠিক করার জন্য ৪ জনের একটা কার্যকরী সমিতি গঠন করে। সেখানে বলা হয় যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মতামত নিয়ে, এই ব্যাপারে যেন সিদ্ধান্ত করে। জাতীয় সঙ্গীত স্তরে কংগ্রেসের মনোভাব যে অস্থির ছিল তা জওহরলালের কার্যকলাপ থেকে স্পষ্ট। তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় সঙ্গীত রচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'জনগণমন'কে যদি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে তিনি ঠিক করে রাখতেন তাহলে অবশ্যই অন্য জাতীয় সঙ্গীত লেখার আহ্বান জানাতেন না।

এক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণীয় যে মহাত্মা গান্ধী কিন্তু বিশাল ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে বন্দেমাতরম্‌কেই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৪৭-এর ২৯ আগস্ট তাঁর প্রার্থনা সভা শুরু হয়েছিল বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে। সেই সভায় উপস্থিত সুরাবর্দি এবং অন্যান্য মুসলমান নেতারা এই ব্যাপারে কোনও আপত্তি করেননি বরং উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। স্বাধীনতার উত্তরকালে গান্ধীর সেই মতের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি বলেই মনে হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পরেও সরকার ও জাতীয় দল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ঠিক করতে দোলাচলচিত্ত হয়েছে। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ লেখার পরে পরেই একটা চক্র তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছিল। 'আনন্দমঠ' প্রকাশের পরেই বঙ্কিমের থেকে বছর তিনেকের ছোট কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১২৮৯) 'আনন্দমঠের মূলমন্ত্র' নামক একটা প্রবন্ধে লেখেন। আনন্দমঠ রচনার জন্য বঙ্কিমের চাকরি যায়নি বটে তবে ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে তাঁকে ওড়িশার যাজপুরে বদলি করা হয়েছিল। চাকরি রক্ষার জন্য আনন্দমঠের রচয়িতা নানা পন্থা নিয়েছিলেন একথা ঠিক; কিন্তু উপন্যাস থেকে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি বাদ দেননি। বঙ্কিম ১৮৮৩ সালের ৬ জানুয়ারী (১২৮৯ সালের ২৩ পৌষ) কালীপ্রসন্নকে যে পত্র দিয়েছিলেন সেখান থেকে বঙ্কিমের মনোবেদনা ও দৃঢ়তা দুটোই স্পষ্ট হয়। 'এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। ...সেই মন্ত্রার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। অমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এই ঈর্ষাপরবশ জাতির উন্নতি নাই। বল, 'বন্দে উদারম্'।

কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া বন্দেমাতরম্‌কেই uncrowned national anthem বলেছে। প্রাচ্য ভাষাবিদ গ্রীয়ার্সন বন্দেমাতরম্ সম্পর্কে নানান অপব্যাখ্যা শুধু করেননি ভারতে মাতৃভূমি-ভাবনা নিয়েও অনেক আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। ভারতীয়রা যেন তারই উত্তরসাধক। '৪৯ সালের নভেম্বরে ভারতের সংবিধান বিধিবদ্ধ হবার পরে জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে আরও অনেকদিন কেটে গেছে। ১৯৪৭-এর জাতিপুঞ্জের অনুষ্ঠানে 'জনগণমন' গাওয়ার সমালোচনা হয়েছে নানা দিক থেকে। এমতাবস্থায় ১৯৪৮-এর ২৫ আগস্টের একটি অনুষ্ঠানে জওহরলাল জানালেন— অর্কেস্ট্রায় সুরসংযোগে গাওয়ার জন্য বন্দেমাতরমের থেকে জনগণমন অধিক উপযোগী বলে ওই গানটিকে জাতিপুঞ্জের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়েছিল। সুর বিশেষজ্ঞরা এ কথাকে নিতান্ত অজুহাত হিসাবেই দেখেছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার, পুণার কৃষ্ণরাও রামচন্দ্র প্রভৃতি সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে সেদিন প্রমাণ করেছিলেন যে বন্দেমাতরম্ অর্কেস্ট্রায় সমানভাবে গীত হতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে তিমিরবরণের সুরসংযোজিত বন্দেমাতরম্ রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তিমিরবরণের প্রদত্ত রাগটির নাম ছিল দুর্গা। কৃষ্ণরাও অর্কেস্ট্রার উপযোগী করে যে সুরারোপ করেছিলেন সেই সুরের নামকরণ হয়েছিল রাষ্ট্রীয়রাগ।

গণপরিষদে ভারতের সংবিধান পেশ করা হলো, অথচ একটা সুপ্রাচীন জাতির জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করতেই তাঁরা ভুলে গেলেন। গণপরিষদ্ এজন্য 'জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ কমিটি' গঠন করেছিলেন সঙ্গীত নির্বাচনের জন্য। দুই বছর পরে কমিটি পূর্বোক্ত দুটি গানকেই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিলেন— কবিগুরুর গানকে যন্ত্রসঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হলো আর বন্দেমাতরম্‌কে দেওয়া হলো যন্ত্রসংগীতের মর্যাদা। এতে বন্দেমাতরম্ সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি, বরং ব্যাপারটা ঘোরালোই থেকেছে। এই বিতর্ক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে গণপরিষদের যে অধিবেশন বসল সেখানে সভাপতি জাতীয়সঙ্গীত সম্পর্কে একটা দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং বন্দেমাতরম্‌কে দ্বিতীয়স্থানে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আলোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয়নি। সদস্যরা হর্ষধ্বনিতে এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন মাত্র। বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত হলো কিনা তার থেকেও বড় কথা সংস্কৃত সঙ্গীত পর্যুদস্ত হলো। আমাদের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনায় প্রথমপর্বে তেরঙ্গার মাঝখানে বন্দেমাতরম্ লেখা থাকত। সেটিও শেষপর্যন্ত ধোপে টেকেনি। একইভাবে সংস্কৃতও জাতীয় ভাষার সিংহাসনে বসেনি। আমাদের হতভাগা জাত এজন্য আনন্দ করবে না মাথা নত করে থাকবে? ■

(লেখক বেহালা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক)

বঙ্কিম গৃহকোণ

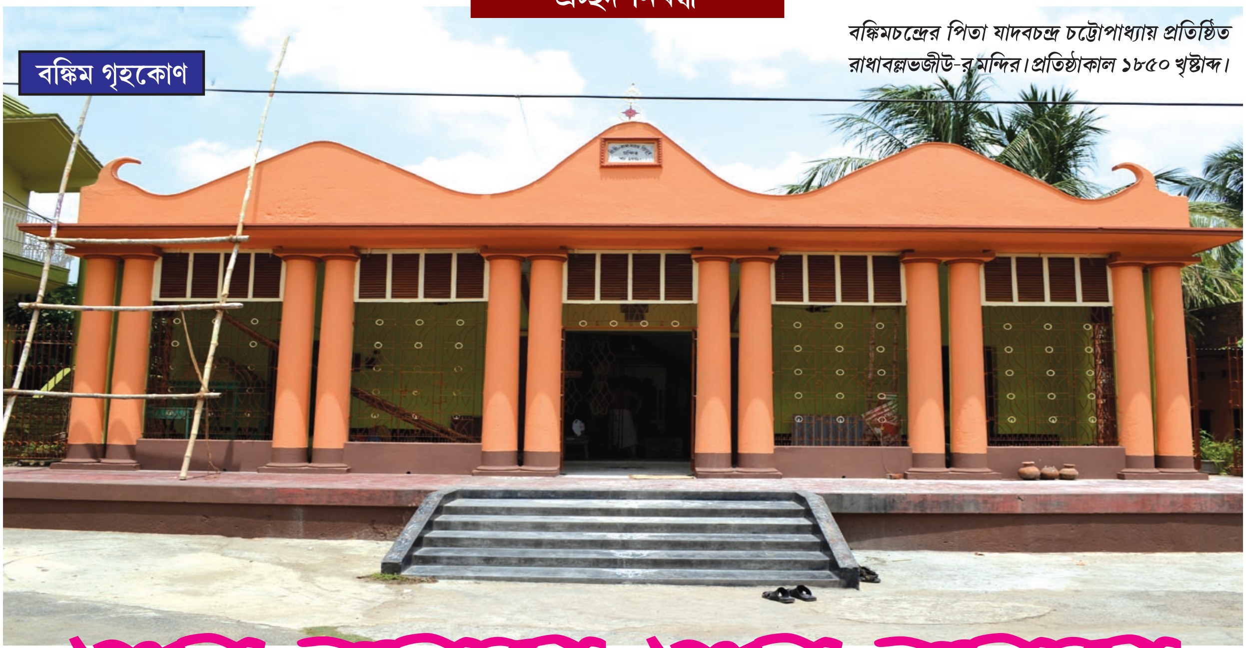

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজীউ-র মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ।

তব ভুবনে তব ভবনে

অর্ণব নাগ

"রাধাবল্লভ আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন, আমাদের সকলের কথা শুনেন, সব আবদার রক্ষা করেন; রোগে-শোকে, বিপদে আমরা তাঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদের বড় ভালবাসেন।"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কুলদেবতা যে সেই কুলের বংশধরদের পরম ভরসাস্থল হবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী! তবে যদি সেই কুলে 'সাহিত্য-সম্রাট' উপাধিধারী কিংবা 'ঋষি' পদবাচ্যে উন্নীত কোনও মানুষের জন্ম হয় এবং তিনি নিজমুখে তাঁর ওপর সেই গৃহদেবতার অপরিসীম প্রভাবের কথা স্বীকার করে গেলে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তকুলের কাছে যে সেই কুলদেবতা সম্পর্কে কৌতূহলের সৃষ্টি হবে তা বলাই বাহুল্য। এঁদের কৌতূহল নিবৃত্ত করা যাক।

১১০৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭০১ খৃস্টাব্দ) বন্দরপুর গ্রাম থেকে নারায়ণ ব্রহ্মচারী ও তাঁর শিষ্য শম্ভু ঘোষাল নৈহাটির কাঁটালপাড়া গ্রামে এসে মন্দির নির্মাণ করে রাধাবল্লভের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কয়েক বছর তাঁরাই বিগ্রহের সেবা করেন। কিছুদিন পর নারায়ণ ব্রহ্মচারী মারা গেলে শম্ভু ঘোষালের পক্ষে একা ঠাকুরের নিত্যসেবা করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তখন নারায়ণ ব্রহ্মচারীর দুই ভাই লক্ষ্মণ ও বলরাম ব্রহ্মচারী কাঁটালপাড়ায় এসে শম্ভু ঘোষালের ছোটভাই রঘুদেব ঘোষালকে মন্ত্রশিষ্য করে তাঁর উপরে ভার দেন রাধাবল্লভের সেবা কাজের। লক্ষ্মণকে রেখে বলরাম চলে যান রায়পুরে। ১০ বছর পর লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী প্রয়াত হলে বলরাম ব্রহ্মচারী কাঁটালপাড়ায় আসেন এবং শম্ভু ও রঘুনাথ ঘোষালকে স্থায়ীভাবে রাধাবল্লভের সেবার অধিকার অর্পণ করেন। এর বছর দশেক পরে বলরাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে কাঁটালপাড়ায় আসেন। রঘুদেব গুরু বলরামের সাধ্যাতীত সেবা করে। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভবপর হয়নি। মৃত্যুকালে তিনি রাধাবল্লভ জীউ এবং অন্যান্য দেবোত্তর সম্পত্তি সমস্তই রঘুদেব ঘোষালের নামে দানপত্র করে দেন।

রাধাবল্লভের কৃপায় সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে রঘুদেব বিগ্রহের জন্য একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের গায়ে নানা কারুকাজ খোদাই করা হয়। এবং মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ছিল,

বাণসপ্ত কলাশকে
রঘুদেবেন মন্দিরম্।

রঘুদেব ঘোষাল নতুনভাবে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন ১৬৭৫ শকাব্দে, ইং ১৭৫৩ খৃস্টাব্দে। রঘুদেব ঘোষাল দীর্ঘজীবী মানুষ ছিলেন। ফলে সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন সূত্রে প্রচুর দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি তাঁর অধিকারে আসে। রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর দৌহিত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়। পরে রামহরির পৌত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র হন এই রাধাবল্লভ এবং দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী। কালক্রমে এই মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। (তথ্যসূত্র : 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র', হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)।

বর্তমানে নৈহাটির কাঁটালপাড়ায় রাধাবল্লভের যে মন্দিরটি দেখা যায় তার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৭২ শকাব্দ, ১২৫৭ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৫০ খৃস্টাব্দ)। মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করান বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেব যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কারণে কাঁটালপাড়ার চাটুজ্যেদের খ্যাতি যতটা, তার চাইতে এঁদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী বিজয়রাধাবল্লভ এবং রথের খ্যাতি নেহাত কম নয়। রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠার নানা কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণ, শ্যামাচরণ-পুত্র শচীশচন্দ্র প্রমুখ চট্টোপাধ্যায় পরিবারের লোকের লেখা ছাড়াও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাতেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

গৃহদেবতা রাধাবল্লভের সূত্রে নৈহাটির কাঁটালপাড়ার সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের যোগাযোগ যে দীর্ঘদিনের তা উল্লিখিত হয়েছে। আনুমানিক ১৮৪০ সালে যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাঁটালপাড়ায় এক বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তার আগেই অবশ্য ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন ওই কাঁটালপাড়াতেই জন্ম নেন বঙ্কিমচন্দ্র। উত্তর, পুবে, পশ্চিমে ছড়ানো যাদবচন্দ্র নির্মিত ওই বাড়িতেই থাকতেন বঙ্কিমচন্দ্র সহ তাঁর বাকি সহোদরেরা— বড়দা শ্যামচন্দ্র বা শ্যামাচরণ, মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র এবং ছোটভাই পূর্ণচন্দ্র।

বাড়ির অনতিদূরে যাদবচন্দ্র তাঁর একমাত্র কন্যা নন্দরাণীকে জমি দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। এই শতাব্দীর গোড়ায় যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বীয় উদ্যোগে নির্মিত বৈঠকখানা বাড়ি। অধুনা 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় পর্যবসিত।

পুনরুদ্ধারের কাজ চলছিল, তখন পুনরুদ্ধারকারীদের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হলো চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আঁতুড়ঘর উদ্ধার করা, যে সূতিকাগৃহে জন্ম বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাটের। পরিবারের প্রাচীন সদস্যদের কথামতো এবং পুরনো দলিল ও নানা প্রাচীন বইপত্র ঘেঁটে অনুমান করা হয় যে, মূল বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে উঠোনের পাশের জায়গাটিই হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রদের পারিবারিক আঁতুড়ঘর। শুরু হয় খনন-কাজ। আশ্চর্যের বিষয় পাওয়া যায় ৩.৯৫ মি. × ২.৮২ মিঃ মাপের একটি ঘরের ভিত। এর পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে জল নিকাশি নালা একেবারে রেললাইনের মধ্যে। এই উৎখননের ফলে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হলো ঋষির জন্মস্থানটি।

এই বাড়ির একটু দূরে দক্ষিণদিকে ১৮৬৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় উদ্যোগে ও খরচে তৈরি করিয়েছিলেন কাদামাটির গাঁথনিতে গড়া তিন কামরার এক বৈঠকখানা বাড়ি। পুবমুখো এই বাড়ির প্রথম ঘরটি বেশ বড়, তার দক্ষিণে দু'টি ছোট ঘর। একটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার ঘর, অন্যটি তোষাখানা। ঘরগুলির দক্ষিণে খোলা জায়গায় ছিল সুন্দর ফুলবাগান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায় এই ফুলবাগানের একটি অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। বড় ঘরটিতে বসত বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরে বঙ্গ-দর্শনের 'মজলিশ'। দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রাজকৃষ্ণ রায়, রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং মধ্যমণি অবশ্যই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— কে না থাকতেন তাতে? বাংলার উনিশ শতকের রেনেসাঁর অন্তিম অধ্যায়টুকুর সূতিকাগার এই ঘরটিকে বললে তা নিশ্চয়ই অত্যুক্তির পর্যায়ে পড়বে না। ১৮৮৭-র জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে বাড়ি কিনলেও কাঁটালপাড়ার ভিটেমাটি-ই ছিল তাঁর স্বধাম।

কাঁটালপাড়ার চাটুজ্যেদের কুলদেবতার কথা আগেই পাঠক জেনেছেন। এখন সেই কুলদেবতার নিত্যসেবার একটি মনোরম বিবরণের দিকে নজর দেওয়া যাক, "তাঁদের বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকালো নিত্যভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়। আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি মুড়াগাছা পরগনায় রাধাবল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হতে তাঁহার সেবা চলে। দুই ঘর চাটুয্যে মহাশয় রাধাবল্লভের সেবাইত, এক ঘর ফুলে, আর এক ঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়িতে যায়। অনেক গরিব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারো মাসে তেরো পার্বণ হয়।" ('বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।

১২৬৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৬২-তে) রথযাত্রার দিন বঙ্কিমচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণের উদ্যোগে কাঁটালপাড়ায় চাটুজ্যে পরিবারের প্রথম রথ বের হয়। শ্যামাচরণ তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেখানেই তিনি কাঠের একটি রথ তৈরি করেন। পরে রথটিকে পেতলের পাত দিয়ে মোড়াই করা হয়। এই রথযাত্রার সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হলো এবছরই। এই রথ উপলক্ষে যে মেলা বসতো তার মনোজ্ঞ বিবরণ মেলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখনীতে। সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে তবে জৌলুস অনেকটাই অবলুপ্ত।

'আত্মবিস্মৃত জাতি'র দীর্ঘকাল অবহেলা আর উদাসীনতায় পড়ে থাকা বঙ্কিমচন্দ্রের ভিটেবাড়িটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৪-তে অধিগ্রহণ করেন। ১৯৯৯-এ প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীনে বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান, তাঁর বসবাসের ঘরগুলির পুরনো কাঠামো অবিকল বজায় রেখে আধুনিক স্থাপত্য- বিজ্ঞানের সাহায্যে সংস্কার করাই যার মূল লক্ষ্য। ১৮৪০-এ নির্মিত বাড়ির কাঠামোটি বিধ্বস্ত হলেও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েনি। ১৮৬২-তে নৈহাটিতে রেললাইন বসে। অবিরাম রেল চললেও গভীর ভিত আর খিলানের জন্যে বাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়নি। বাড়ির গাঁথনি মাটি ও চুন-সুরকির। ৩০ ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল। জোড়া স্তম্ভ আর খিলানের ওপর গাঁথা এই বাড়ির ভিতের গভীরতা ৫ ফুটেরও বেশি। ২০০৩-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে যে সংরক্ষণ ও নির্মাণের কাজ শুরু হয় তা শেষ হয় ২০০৭-এ।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বীয় উদ্যোগে নির্মিত বৈঠকখানাবাড়িতে 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' চলছে বর্তমানে। বঙ্গের তীর্থক্ষেত্রে বঙ্কিম তীর্থ যে অধুনা একটি উল্লেখযোগ্য

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের রথ।

সংযোজন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলার সাহিত্য তথা মনোজগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ভিটেবাড়ি উদ্ধার করতে যেভাবে তাঁর মৃত্যু শতবর্ষের পরও অনেকদিন পেরিয়ে গেল তাতে প্রশ্ন জাগে, আমাদের 'আত্ম-বিস্মৃত' বদনাম ঘুচবে তো?

তথ্যসূত্র : 'শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও রথের মেলা', 'বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্রের কথা' : ডঃ বিজলি সরকার।

ছবি : নির্মল সাহা

পৌরাণিক নগর অযোধ্যা

গোপাল চক্রবর্তী

অযোধ্যা অতি প্রাচীন জনপদ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থে বহু স্থানে অযোধ্যার উল্লেখ আছে। অযোধ্যায় সূর্যবংশীয় রাজাদের বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়। প্রাচীন কিংবদন্তী ও জনশ্রুতিতে বিষ্ণুর অবতার দাশরথি রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যের সঙ্গে অযোধ্যার নাম বিশেষভাবে যুক্ত। অযোধ্যা প্রাচীনকালে কোশল নামেও পরিচিত ছিল। এই জনপদ পশ্চিমে সুমতি, পূর্বে সদানীরা, দক্ষিণে সর্পিকা বা স্যান্দিকা নদী উত্তরে নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

এই জনপদে অযোধ্যা, সাকেত ও সারথী বা শ্রাবস্তীর মতো তিনটে বড় নগর ছাড়াও সেতব্যা উক্কট্টহ প্রভৃতির মতো ছোট ছোট শহরও এই জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান ফৈজাবাদ জেলার সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগর। অনেকেই সাকেত ও অযোধ্যাকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু অধ্যাপক Rhys Davids বলেন— বুদ্ধের সময় দুটো শহরই ছিল। অচিরাবতী বা রাপ্তী নদীর তীরে সাবথী বা শ্রাবস্তী ছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর। এর অবস্থান ছিল সাহেঠ ও মাহেঠ নামে পরিচিত গোন্ড নদীর প্রান্তে বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বহরইচ জেলায়।

রামায়ণে সূর্যবংশীয় পঁচিশজন রাজার একটি তালিকা পাওয়া যায়, যারা পর্যায়ক্রমে অযোধ্যায় রাজত্ব করেছেন। এই বংশের প্রথম রাজা মান্ধাতা। এই বংশ পর্যায়ক্রমে ইক্ষ্বাকু, সগর এবং রঘুবংশ নামে খ্যাত। রাজারা হলেন যথাক্রমে মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, পৃথু, ইক্ষ্বাকু, ভরত, খাণ্ডে, দন্ত, হারীত, হরিবীজ, হরিশ্চন্দ্র, রুহিদাস বা রোহিত, সগর, অসমঞ্জ, ভগীরথ, সৌদাস, সুদাস, দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রাম, লব-কুশ।

এই বংশের শাখা কুক্ষিমারা, শিথিলা ও ভীমশালা বা বৈশালীতে রাজত্ব করতেন। পুরাণে বর্ণিত যে সমস্ত রাজা কোশলে প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করেছেন সঠিকভাবে তাঁদের খুঁজে বার করা দুরূহ ব্যাপার। পুরুকুৎস, এসদস্যু, ঋতুপর্ণ এবং আরও কয়েকজনের নাম অযোধ্যার রাজা হিসাবে রামায়ণে স্থান পায়নি। কিন্তু ইবাদিক সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি এইসব রাজাদের মধ্যে সকলে না হলেও অনেকে কোশলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। পুরাণে বর্ণিত রাজা ও রাজকুমারদের মধ্যে যাদের কথা আমরা বৈদিক এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে জানতে পারি তাঁরা হলেন হিরণ্যনাভ, প্রসেনজিত এবং শুদ্ধোদন। এঁরা কোশল অথবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

প্রাচীন কোশলের বংশতালিকা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। পুরাণের উপর যদি নির্ভর করা যায় তাহলে দিবাকর নামে জনৈক রাজা অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন অধিসীমকৃষ্ণের সমসাময়িক। অধিসীমকৃষ্ণ ছিলেন পরীক্ষিতের প্রপৌত্রের পুত্র। কিন্তু দেখা যায় যে রাজকুমারেরা পরীক্ষিতের উত্তরাধিকারী রূপে চিহ্নিত তারা অবিচ্ছিন্নভাবে এবং পরম্পরা অনুসারে একই অঞ্চলের উপর রাজত্ব করেননি। মহাভগ্গ থেকে আমরা জানতে পারি যে গোড়ার কাশির ব্রহ্ম দত্তদের সময় কোশল ছিল একটি ছোট্ট এবং দুর্বল রাজ্য যার সম্পদও ছিল সামান্য— "দীঘীতি নাম কোসল রাজা অহোসি দলিদ্দো নাম কোসল রাজা অহোসি দলিদ্দো অপ্পধনো অপ্পধগো অপ্পবলো অপ্পবাহনো অপ্পবিজিতো অপরিপুন্ন- কোসকোটঠা-গারো।"

জৈন ঐতিহ্যানুযায়ী চব্বিশজন তীর্থংকরের তেইশজনই ইক্ষ্বাকুবংশীয় ছিলেন, এঁদের মধ্যে স্বয়ং আদিনাথ বা ঋষভদেব এবং অন্যান্য চারজন অযোধ্যাতেই জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুযায়ী অযোধ্যা ব্যতীত শ্রাবস্তীতেও কোশলরাজদের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ প্রথমে সাকেত এবং পরে শ্রাবস্তী কোশলের রাজধানী হয়।

অযোধ্যা গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি প্রধান নগরী ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তদের পতন হলে অযোধ্যা প্রথমে মৌখরীদের এবং পরে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙ্ ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁর বিবরণ অনুসারে অযোধ্যায় তৎকালে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিল। অযোধ্যার শতাধিক মঠে হীনযানী ও মহাযানী মিলিয়ে তিন হাজার ভিক্ষু অবস্থান করতেন। এখানকার জনসাধারণ সদ্ব্যবহারপরায়ণ, সৎকর্মপ্রিয় এবং ব্যবহারিক বিদ্যায় অনুরক্ত ছিল।

অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে অযোধ্যা প্রথমে যশোবর্মার এবং পরে গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পর অযোধ্যা প্রথমে শ্রীবাস্তবদের এবং পরে কন্যাকুব্জের গাহড়বাল শক্তির অধীন হয়। ১১৯৩ খৃস্টাব্দে গাহড়বাল বংশের রাজা জয়চন্দ্র মুসলমানদের হাতে নিহত হলে অযোধ্যা মুসলমান অধিকারে চলে যায়। ক্রমশ অযোধ্যা দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানী হয়ে ওঠে। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অযোধ্যার শাসকের পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পদের অধিকারীরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতেন।

তোগলক আমলে এই অঞ্চলে বার বার বিদ্রোহ ঘটে; এরফলে শার্কীদের অধীনে জৌনপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অযোধ্যা তার অন্তর্ভুক্ত হয়। অবিরত যুদ্ধের ফলে শার্কী বংশের অবসান ঘটলে লোদীরা অযোধ্যাকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।

১৫২৬ খৃস্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের হাতে লোদী সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ঘটলে অযোধ্যা মোগল শাসনাধীনে যায়। স্থানীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য বাবর একবার অযোধ্যায় অল্প কয়েকদিন বাস করেন। বাবরের নির্দেশে তাঁর সেনাপতি মীর বাকী শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ 'জন্মস্থান' মন্দিরটি ধ্বংস করে সেই স্থানে 'বাবরি মসজিদ' নামে খ্যাত মসজিদটি নির্মাণ করেন। বলা বাহুল্য মসজিদটির নির্মাণে বিধ্বস্ত মন্দিরের উপকরণ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

শেরশাহের হাতে হুমায়ুনের পরাজয়ের পর অযোধ্যা আফগান অধিকারে চলে যায়। সম্রাট শেরশাহ এখানে একটি টাঁকশাল স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে একাধিক মোগল সম্রাটের আমলেও এই টাঁকশালটি চালু ছিল। আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী আকবরের রাজত্বকালে 'অবধ্-কা- হাবেলী' নামে পরিচিত বর্তমানের অযোধ্যা শহর এবং এর শহরতলি, অবধ্ সুবার অন্তর্গত অবধ সরকারের দুটি মহল ছিল। ১৬১১ খৃস্টাব্দে ইংরেজ বণিক উইলিয়াম

ফিন্‌চ তাঁর বিবরণীতে অযোধ্যাকে বাণিজ্য সমৃদ্ধ স্থান বলে বর্ণনা করেছেন।

১৭৬১ খৃস্টাব্দে আহমদ শাহ্ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে অযোধ্যার তৎকালীন নবাব সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের বিপক্ষে আবদালীর পক্ষে যোগদান করেন। সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফউদ্দৌলার সময়ে অযোধ্যার রাজধানী ইফজাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসী নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে রাজ্যচ্যুত করে অযোধ্যাকে কোম্পানীর ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইংরেজদের অবিবেচনা প্রসূত কাজের ফলে এখানকার পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠে এবং এই অঞ্চলে দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। অযোধ্যা অঞ্চল ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। এখানকার প্রায় সব জমিদাররাই বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছিল। এবং তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছিল। এই অঞ্চল থেকে বৃটিশ শাসন প্রায় সম্পূর্ণরূপে কিছুদিনের জন্য উৎপাটিত হয়। অবশেষে বিদ্রোহ দমন হলে অল্পদিনের মধ্যে অযোধ্যা অঞ্চলে ইংরেজ শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী এবং হনুমানের অসংখ্য মন্দির দেখা যায়। ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর হাজার হাজার করসেবক এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রামমন্দিরের উপর নির্মিত বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দেয়। অযোধ্যায় ত্রেতাকা ঠাকুর-এর মন্দির অঞ্চলে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন বলে কথিত আছে। এখানকার বর্তমান মন্দিরটি তিনশ বছর আগে কুলুর রাজা নির্মাণ করিয়েছিলেন। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে রাণী অহল্যাবাঈ এটি পুনঃনির্মাণ করেন। শোনা যায় যে কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রাচীন মূর্তি আওরঙ্গজেব সরযূর জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। পরে তা উদ্ধার করে নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একমাত্র একাদশী তিথিতে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নাগেশ্বরনাথ (শিব)-এর মন্দিরটি শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ কর্তৃক নির্মিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। হনুমান গড়ির হনুমানের মন্দিরে সর্বাপেক্ষা বেশি লোক সমাগম হয়। মন্দিরটা বৃহৎ এবং দুর্গবিশিষ্ট। অন্যান্য স্থানের মধ্যে সীতাকা রসোই (সীতার রন্ধনশালা) বড় আস্তান (প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী নির্বাসনান্তে এখানে রামের অভিষেক হয়েছিল) রত্নসিংহাসন, রঙমহল, আনন্দভবন (প্রবাদ অনুযায়ী কৌশল্যা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), কৌশল্যা ভবন, ক্ষীরেশ্বরনাথ (শিব)-এর মন্দির, শিশমহল মন্দির, তুলসী চৌরা (লোকশ্রুতি অনুসারে এখানে তুলসীদাস 'রামচরিতমানস' এখানেই শুরু করেছিলেন।) অযোধ্যার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি হলো—জানকীতীর্থ, চন্দ্রহরি ধর্মহরি, স্বর্গদ্বার ঘাট, রামঘাট, সুগ্রীব কুণ্ডু, মণিরাম কী চাউনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্বর্গদ্বার ঘাটের কাছে প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করে আওরঙ্গজেব যে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন তাও কালের স্পর্শে ধ্বংসপ্রায়। মণি পর্বত নামে খ্যাত ২০ মিটার (৬৫ ফুট) উচ্চ টিলাটি কোন বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা হয়। রাম কোটের দক্ষিণ পূর্বে যে দুটি ছোট টিলা আছে তার একটির নাম সুগ্রীব পর্বত। ক্যানিংহামের মতানুসারে দু'টি টিলাই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পঞ্চতীর্থংকরের মন্দিরগুলি জৈনদের কাছে অতি পবিত্র। সুমিত্রা ঘাটের কাছে শিখদের একটি ধর্মস্থান আছে। কথিত আছে গুরু নানক এখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

অযোধ্যায় কয়েকটি বিশেষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া থেকে শ্রাবণ ঝুলার মেলা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন মন্দির থেকে মূর্তিগুলি শোভাযাত্রা সহকারে মণিপর্বতে নিয়ে যাওয়া হয়। চৈত্র মাসে রামনবমীর মেলা এবং কার্তিক পূর্ণিমার মেলাও উল্লেখযোগ্য। কার্তিকের শুক্লাপক্ষের একাদশীতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা হয়। হাজার আক্রমণ এবং ধ্বংসলীলাতেও অযোধ্যার গৌরব একটুও ম্লান হয়নি। ■

লৌকিক দেবতা খাঁদুরাণী

নবকুমার ভট্টাচার্য

বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া থেকে কিছু দূরে তালড্যাংরা থানার অন্তর্গত দেউলভিড়্যা গ্রামের লৌকিকদেবী খাঁদুরানী। সারা গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এমন অনেক লৌকিক বা গ্রাম্য দেবদেবী রয়েছেন যাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আশপাশের দু' পাঁচটি গ্রামেও ছড়িয়েছে। খাঁদুরাণীও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

দেউলভিড়্যা গ্রামে একপ্রান্তে শালগাছ, আঁশগাছ আর নাম না জানা কয়েকটি গাছের নীচে এই দেবীর অবস্থান। মন্দির বলতে যা বোঝায় তা কিছুই নেই। মানুষের দেবতা সাধারণ ভাবেই বাস করছেন। মাসের প্রতি সংক্রান্তিতে দেবীর পুজো হয়। এই দিনে দুধ কলা বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে পুজো দেওয়া প্রচলিত বিধি। নিত্য কেউ জল ফুল দিলে তবে পুজো হয়, না হলে সংক্রান্তিতে অবশ্যই পুজো হবে। মানসিকের পুজোয় ছাগ-মেষও বলি হয়। এই গ্রামের লোকের বিশ্বাস দুধ চিঁড়ে দিয়ে মানত করলে হারানো গরুবাছুর ও ভেড়ার সন্ধান মেলে। এছাড়াও প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে পূর্বদিন সন্ধ্যায় একটি গোটা পান সুপারি দিয়ে মানত করলে বিয়েবাড়ির প্রয়োজনীয় বাসনপত্র পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে যে ঘটনাটি রয়েছে, তা হলো গ্রামের এক গরীব মানুষ তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে অভাবের তাড়নায় দানপত্র থালা গ্লাস সংগ্রহ করতে না পেরে শেষে বিয়ের পূর্বে সন্ধ্যাকালে একটা গোটা সুপারি পান দিয়ে মায়ের কাছেই মানত করে বসে। পরদিন সকালে দেখা যায় মূর্তির সামনে দু'টি বড় কাঁসার থালা বাটি ও গ্লাস রয়েছে। তবে এ ঘটনা কতকাল পূর্বের। এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। গ্রামের সবাই দীর্ঘকাল ধরে একথা শুনে আসছেন। খাঁদুরাণীর মূর্তিটি পাথরে তৈরি। তবে দেখলে মনে হয় যেন পুরুষ মূর্তি। উত্তোলিত ডান হাতে অসি, বাম হাত বুকের কাছে মুষ্টিবদ্ধ। পরনে কোঁচানো কাপড়, কানে কুণ্ডল এবং মাথায় শিরোভূষণ। পাথরের উপর মূর্তিটি খোদাই করা, তবে নাসিকা ভগ্ন। তাই খাঁদুরাণী নামে পরিচিত। মূর্তির আবার আয়তন দেখলে মনে হবে এটি যেন এককালে কোনও জৈন মন্দিরের অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। খাঁদুরাণীর মূর্তিটি হাজার বারশো বছরের পুরনো বলেই মনে হয়। খাঁদুরাণীর মূর্তিটি সিন্দুরে লেপা এক দেবীর। গ্রামের লোকেরা তাকে চণ্ডী দেবী বলেই মানে। মানত করে। খাঁদুরাণীর পুজোর মন্ত্র সংস্কৃত নয়। গ্রামীণ ভাষায়ই এই দেবীর পুজো হয়। তফশিলি জাতির এক সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে এই দেবীর পূজক। বছরে একবার খাঁদুরাণীর মেলাও বসে। ■

অঙ্গনা

সোনার দামে আকাশ ছোঁয়া তাও সোনাই নারীর পরম পাওয়া

কৃষ্ণকলি মুখার্জী

বৈশাখ মাস পড়তে না পড়তেই উত্তর কলকাতার বাগবাজার-এর ঘোষবাড়ির কর্তা শ্রী প্রসাদ চন্দ্র ঘোষের মাথায় হাত। না, গ্রীষ্মের অতি প্রাবল্যের জন্য গলদঘর্ম হয়ে তিনি মাথায় হাত দেননি। সামনের আষাঢ় মাসের পুণ্যলগ্নে ঘোষ কর্তা গিন্নীর জ্যেষ্ঠা কন্যা নৃপার বিয়ে ঠিক হয়েছে উত্তর কলকাতারই এক বনেদী পরিবারে। ছোটো কন্যা দীপাও প্রায় দিদির ঘাড়েই নিঃশ্বাস ফেলছে। তাই নৃপার পরেই দীপার পালা। ঘোষ গিন্নীর হাজারো স্বপ্ন দুই মেয়ের বিয়ে নিয়ে। এই দুর্মূল্যের বাজারে দুই মেয়েকে পার করানোর যে বিস্তর চিন্তা তা সামাল দিতে ঘোষ পরিবার নাজেহাল। বাকি খরচের বোঝা নয় নয় করে সামলাতে পারলেও বিয়ের প্রধান সজ্জাসামগ্রী সোনার অলঙ্কার, তা কিভাবে জোগাড় করা যাবে? প্রসাদবাবুর মতো হাজার হাজার পিতৃ হৃদয় বঙ্গসমাজের অলিতে-গলিতে এই প্রশ্ন, দুশ্চিন্তাকে বুকে বয়ে এগিয়ে চলেছেন।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছে সোনা আজ শুধুই স্বপ্নে দেখা 'রাজকন্যার মতো' এক অলীক কল্পনা মাত্র। যে ধাতুর দাম ভরি পিছু প্রায় উনত্রিশ হাজার টাকা— তাকে গলায়, কানে, হাতে সাজাতে বাঙালি আজ অক্ষম। মা-ঠাকুমার রাখা গয়নাই তাই সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ বাড়ির বিয়ের একমাত্র সম্বল। কিন্তু এই এত শত জল্পনা কল্পনার ঊর্ধ্বে সত্যি একটাই বাঙালি আজও সোনাকে নিজের থেকে আলাদা করতে পারেনি। তাই মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের স্লোগান অনেকটা এইরকম— ভরপেট নাও খাই/মেয়ের বিয়েতে খাঁটি সোনা দেওয়া চাই।

সন্ধ্যাবেলায় যদি কখনও সেন্ট্রাল এভিনিউ পার হয়ে বৌবাজারের পথ ধরে হাঁটা যায় তাহলে সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবেই। বৌবাজারে পথের দু'ধারে সার বাঁধানো সোনার দোকান সারা বছর আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষমান। কোলে মার্কেট থেকে বাজারের থলি হাতে ফেরা মানুষের চোখ কিম্বা সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে ক্লান্ত দেহে আপিস ফেরতা মানুষের চোখ ওই সার বাঁধানো সোনার দোকানের শো কেসে সাজানো স্বর্ণালঙ্কারের শোভার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে নিজের গন্তব্যের পথে চলে।

তবে বর্তমানে স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে কাজ করে চলেছে। এমন কিছু সোনার অলঙ্কার এখন বাজারে প্রস্তুত হচ্ছে যাতে স্বল্প সোনায়, স্বল্প মূল্যে অচিরেই সাজিয়ে তোলা যায় বিয়ের কনেকে। ব্রোঞ্জের সঙ্গে সোনার সংমিশ্রণেও গয়না প্রস্তুত হচ্ছে যাতে তা মধ্যবিত্তের নাগাল ছুঁতে পারে। নামী-দামী সোনার দোকানগুলিতে মাসিক কিস্তিতে টাকা ভাসিয়েও গয়না কেনার সুযোগ করে দিচ্ছেন দোকান কর্তৃপক্ষগুলি। এছাড়াও নববর্ষ এবং ধনতেরাসের সময় মজুরিতে ছাড়, আনুষঙ্গিক উপহার জেতার সুযোগ তো আছেই।

বর্তমানে ক্ষুদ্র সোনার দোকানগুলিও উন্নত ব্যবসা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার দৌড়ে নিজেদের ব্যবসার গুণগত মানকে অনেকাংশে এগিয়ে নিয়েছেন। বড়ো বড়ো সোনার দোকানগুলি প্রত্যেকেই নিজের নামের সঙ্গে একটি করে TAG LINE ব্যবহার করছে, এর ফলে মানুষের আবেগের সঙ্গে আত্মস্থ হওয়ার পথটি অনেক সুগম হয়েছে। সৃজি নোনি রূপশৃঙ্গার প্রভৃতি বিকল্প স্বর্ণলঙ্কার প্রস্তুতকারক সংস্থাও ব্যবসায়িক দৌড়ে সমান তালে এগিয়ে চললেও সোনাকে, সোনার চাহিদাকে অতিক্রান্ত করতে পারেনি। সোনা কেনার সুযোগ ৯ মাসে ৬ মাসে একবার এলেও বাঙালি আজও সোনার অপেক্ষাতেই দিনযাপন করে চলেন। মানতাসা, কানপাসা, রতনচূড়, একাঙ্গুরিও, বালা বাউটি একমনকি গলার চেনটুকুও সোনা ছাড়া বাঙালি ভাবতে পারেন না। আর শুধুই তো বিয়ে নয়, অন্নপ্রাসন, উপনয়ন, স্বাদ অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল আচারের সঙ্গেই এক টুকরো সোনার সম্পর্ককে কোনওদিনই অস্বীকার করা যাবে না। তাই সোনার বিকল্প বাঙালি ভাবতেই পারে না।

বসুতে বসুতে লড়াই : শুদ্ধ সর্বহারা বনাম অশুদ্ধ সর্বহারা

মাননীয় বিমান বসু
রাজ্য সম্পাদক, সি পি এম
৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা

মহাশয়,

শুদ্ধিকরণ শুরু করার জন্য আপনাকে শুভেচ্ছা। শুরুতেই আরামবাগের অশ্লীল অনিল বসুকে বিতাড়িত করা গেছে। তবে সেকাজ অনেকটাই কমে গেছে। বেশি লোককে তাড়াতে হবে না। বিশেষ করে নিচুস্তরে। তারা অনেকেই ইতিমধ্যেই তৃণমূলে প্রবেশ করেছে। সেখানে তো শুদ্ধিকরণের স্লোগানই নেই।

যাক, আপাতত অনিল বসুতেই থাকা যাক। আপনারা প্রথমে তিন মাসের সাসপেন্ড করেই শুদ্ধিকরণ পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে পোষাল না অনিল বসুর। উনি চাইছিলেন একেবারে দল থেকেই তাড়ানো হোক। তাই স্ত্রী সবিতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধেই মানহানি মামলার তোপ দাগলেন। উনি নিশ্চিত হয়েই সাংবাদিক সম্মেলনটা করেছিলেন। জানতেন এমন নজির কমিউনিস্ট পার্টিতে নেই। সুতরাং দল এবার তাড়াবেই। আপনারাও সেই টোপ গিলে প্রথমে রাজ্য কমিটিতে সুপারিশ তৈরি করা এবং পরে তা কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন আদায় করার প্রক্রিয়াটা চালালেন। বহিষ্কার করলেন দল থেকে।

অনিল এখন মুক্ত। ডানা মেলে উড়ে যেতেই পারেন। দল ঠিক জুটে যাবে একটা। কিন্তু আপাতত তাঁর যা মতিগতি তাতে তিনি চাইছেন আপনাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে। প্রথমেই আপনাকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। বামাল করার প্রক্রিয়াও যে কোনও সময় শুরু হতে পারে। বুদ্ধবাবু, সূর্যবাবুদের কাছাতেও টান দেবার মতলব আরামবাগের সাতবারের সাংসদের। এক কালের দলের সম্পদ আজ দলের শত্রু।

সুতরাং ২০১২ সালে এক নতুন শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হলো। একদিকে শুদ্ধ সিপিএম। অপরদিকে অশুদ্ধ সিপিএম।

আপনাদের গুরু মার্কস সাহেব শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সর্বহারার হাতে ক্ষমতা আসার যে বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা দিয়েছিলেন পত্রলেখকের মোটা মাথাতেও তা পরিষ্কার। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা একদিন সর্বহারা সৃষ্টি করবে। সেই প্রোলেতারিয়েতদের সঙ্গে পুঁজিবাদীদের সতত শ্রেণী সংগ্রাম চলবে। এইভাবেই একদিন শেষ হবে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই একদিন জন্ম নেবে কমিউনিস্ট সমাজ। যার নেতৃত্বে থাকবে সর্বহারা।

অনিল বসু

বিমান বসু

ছয়ের দশকে কমিউনিস্ট চীন ও কমিউনিস্ট রাশিয়ার মধ্যে যখন জমি দখলের লড়াই লাগে তখন প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ রূপদর্শী ছদ্মনামে এক সংবাদভাষ্য লিখেছিলেন। তাতে তিনি রুশি সর্বহারাদের সঙ্গে চীনা সর্বহারাদের লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন এই লড়াইয়ে অনেক মার্কসবাদী ধাঁধাঁয় পড়েছেন। তাঁরা ভাবছেন, এ আবার কী হলো? একজন সর্বহারা আর এক সর্বহারাকে ভাজা করে খেতে পারে কি না এবং মার্ক্সীয় তত্ত্বে এরূপ কোনও নিদান আছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখাও চলছে।

রূপদর্শী যে দূরদর্শীও ছিলেন সেটা আজ পরিষ্কার। কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে এখন (অতীতেও ছিল, বর্তমানে বেশি) যা চলছে তাতে সাধারণ কমিউনিস্টরা এটাই ভাবছেন। লড়াইটা কার সঙ্গে কার? কদিন আগেও যিনি অনিল বসু এবং বিমান বসুকে সমান সর্বহারা বলে জানতেন তাদের মনে প্রশ্ন, কে বেশি সর্বহারা। এটা কোন শ্রেণী সংগ্রাম?

বিমানবাবু এমন জটিল প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। আপনার কাছে আছে কিনা জানি না। উত্তর জানা ছিল রূপদর্শীর। তার চার দশক আগের লেখা হুবহু তুলে দিয়েই চিঠি শেষ করব।

“শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াতে পারে, যথা : এই বিরোধ সাচ্চা সর্বহারার সঙ্গে সাচ্চা সর্বহারার নয়, এ বিরোধ শোষিত সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে অশোধিত সর্বহারা শ্রেণির। এই শ্রেণি সংগ্রামের ফলে একদিন পরিশোধিত সর্বহারার সৃষ্টি হবে। এবং তারপর এই পরিশোধিত সর্বহারার নেতৃত্বে আবার বুর্জোয়া শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সর্বহারার মুলতুবি লড়াই শুরু হবে। এইভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হবে এবং সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর গজিয়ে উঠবে শোষণহীন এক নতুন সমাজ যার নায়ক, পরিচালক এবং কর্ণধার হবে সর্বহারা— না না, শুধু সর্বহারা নয় পরিশোধিত স র্ব হা রা। মার্ক্সবাদী ইতিহাসের এটা হচ্ছে লুপ লাইন।”

ভাল থাকবেন বিমানবাবু। একটা কথা শুধু জানিয়ে রাখি। ব্যক্তি দলের থেকে বড় নয়। সুতরাং এক অনিল গেলে আর এক অনিল প্রোডিউস করবে দল। তবে বেশি খেপাবেন না। ফস্ করে উনি অনেক কেচ্ছা কাহিনি ফাঁস করে দিতে পারেন!

—সুন্দর মৌলিক

অতিথি কলম

আর্থিক সংকটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ডঃ অশ্বিনী মহাজন

বিগত কয়েক বছরে ইউরোপে চূড়ান্ত আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে গ্রীস, ইতালি, স্পেন এবং পর্তুগালের মতো কয়েকটি দেশের অর্থব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায়। কোনও দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সংকট তখনই দেখা দেয় কখন কোনও দেশ তার গৃহীত ঋণ শোধ করতে না পারে। গ্রীসে এই সংকট তখনই দেখা দেয় যখন গ্রীস সরকার তার ঋণ শোধ করতে অসমর্থ হয়। সে সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের হস্তক্ষেপে সমস্যার তাৎকালিক সমাধান হলেও গ্রীসের সংকট থেকেই যায়। এর কারণ ইউরোপের দেশগুলো গ্রীসকে অর্থসাহায্য দেওয়ার সময় এমন সব শর্ত দেয়— যার ফলে গ্রীসকে সরকারি খরচে ব্যাপক পরিমাণে কাটছাঁট করতে স্বীকৃত হতে হয়।

গ্রীসের বিপদ কোথায় :

গ্রীস জি ডি পি-র দৃষ্টিতে বিশ্বের ৩২তম দেশ। ২০১০ সালে গ্রীসের জনপ্রতি আয় ২৮ হাজার মার্কিন ডলার নির্দিষ্ট ছিল। এই নিরিখে গ্রীস বিশ্বে ২৪তম স্থানে ছিল। ২০০৯-এ গ্রীসের অর্থব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়। তার আগে পর্যন্ত গ্রীস প্রতিবছর অর্থক্ষেত্রে উন্নতি করছিল। ২০০৮-এ গ্রীসের বাজেট ঘাটতি জিডিপি-র ৭.৭ শতাংশ ছিল। তখন কিন্তু সরকারি ঋণ জিডিপি-র ১১০ শতাংশ ছিল। ২০১০-এ সেই ঋণও জিডিপি-র অনুপাত বাড়তে বাড়তে ১৪২.৮ শতাংশে পৌঁছায়। ওই সময়ে ইউরোপীয় দেশসমূহের ঋণের অনুপাত ৭০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৫.১ শতাংশে পৌঁছে যায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও অর্থসংকটের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু ওই সব দেশে জিডিপি এবং ঋণের অনুপাত তত বেশি ছিল না। গ্রীসের থেকে কম। তারাও বাজেটে ছাঁটাই করে সামাল দিতে চেষ্টা করতে।

ব্যাপক পরিমাণে ঋণ, ঋণ আদায়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে গ্রীসের সার্বভৌমত্বের সংকট উৎপন্ন হয়। এই উৎকট সময়ে ইউরোপের দেশগুলো 'সাহায্য-প্যাকেজ' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে গ্রীসের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ভোট দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং শর্ত দেওয়া হয়— আগামী তিন বছরের মধ্যে বাজেট ঘাটতি কমিয়ে তিন শতাংশে নিয়ে আসতে হবে। এজন্য গ্রীসের সরকার পদক্ষেপ নেয়— সরকারি চাকরির সংখ্যা কমানো, বেতন কম করা, সামাজিক সুরক্ষা খাতে খরচ কমানো শুরু হতেই গ্রীসে গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সরকারের জনপ্রিয়তা কমে যায়।

সে সময়ে গ্রীসের সবক'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতৈক্য ছিল না। তা সত্ত্বেও সরকারকে খরচ কমানোর জন্য সংসদে প্রস্তাব পাস করাতে হয়। কেননা, তা না হলে বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গ্রীস মহাসংকটে পড়ত। সরকার খরচ কম করাতে— সামাজিক পরিষেবা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে খরচ কমে গেল। যার ফলে সাধারণ মানুষের উপর সোজাসুজি প্রভাব পড়ল। কেননা, বেকার ভাতা, বৃদ্ধাবস্থায় পেনশন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমে গেল। একথা সর্বজনবিদিত যে, যে সরকার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না, দেশের মানুষ তাকে পছন্দ করে না। গ্রীসের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলে এরকমই ইঙ্গিত মিলেছে। ৭ মে, ২০১২-তে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দুটি প্রমুখ দলের কেউই সরকার গড়ার মতো গরিষ্ঠতা পায়নি।

ভোটাররা সামাজিক খরচ কম করার সপক্ষে যে সকল প্রার্থী ছিলেন তাদেরকে বাতিল করে দিয়েছে। যাঁরা এর বিরোধী, তাঁদেরকেই নির্বাচিত করেছেন। ওই প্রার্থীরা

> **“বর্তমানে ছোট ছোট দেশ— গ্রীস, পর্তুগাল এবং আয়ারল্যান্ডকে সাহায্যের প্যাকেজ দিয়ে অর্থসংকট থেকে বের করে আনার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ইতালি, স্পেনের মতো বড় দেশের সমস্যা সমাধানের পথ ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে নেই। যদি সকলে একই ইউনিয়নে থাকতে চান তাহলে বাজেটে কাটতি করতে হবে, খরচ কম করতে হবে। এরকম করলে তাদের নিজ দেশবাসীর বিরাগভাজন হতে হবে। আর যদি ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব মুদ্রায় ফেরত আসে তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপে পড়তে হবে।”**

আন্তর্জাতিক সঞ্জীবনী প্যাকেজের বদলে বাজেটে খরচ কমানোর বাধ্যবাধকতার পক্ষে নন।

বিশ্লেষকদের অভিমত, এই পরিপ্রেক্ষিতে কোনও জোট সরকার ক্ষমতায় বসবে আর বাজেটে খরচ কমানো বাতিল করবে। তখন গ্রীস ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভাঙন দেখা দেবে। গ্রীসও ইউরো'র পরিবর্তে ড্রাকমা'তে (গ্রীসের মুদ্রা) ফেরত আসবে। গ্রীসকে প্রদত্ত সহায়তা বন্ধ হবে, গ্রীসও বাজেট-এ ছাঁটাই বন্ধ করে দেবে। গ্রীসের সরকারের পক্ষে দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা, যেমন— ভোজন, পেট্রল প্রভৃতি সরবরাহ করা কঠিন হবে। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতি হর্মন বেন রোমপে বলেছেন, গ্রীস অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত কোনও দেশের নেতা যদি ঘোষণা করেন যে, তিনি ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে চলবেন সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন।

যুক্তিতর্ক যাই চলুক না কেন— এটা পরিষ্কার যে, গ্রীসকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিপদে পড়েছে। গ্রীসের নেতারা যদিও পৃথক হওয়ার কথা বলেননি। তবে একথা শোনা যাচ্ছে যে, গ্রীসের বেশির ভাগ মানুষই কিন্তু তাদের দেশের পুরাতন কারেন্সি চালু করতে চান।

বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ১৫টি দেশের অভিন্ন মুদ্রা হলো 'ইউরো'। সবাই এক ঝটকায় ইউরো-তে আসেনি। ধীরে ধীরে নিজেদের মুদ্রার বদলে 'ইউরো'-কে গ্রহণ করেছে। বিগত কয়েক বছরে সংকট ক্রমশ বেড়েছে। বেশির ভাগ দেশই কিন্তু একটা তাগিদ অনুভব করছে পিছনে ফেরার। এই কঠিন সময়ে যদি রাজনৈতিক মতৈক্য শেষ হয়ে যায় তাহলে 'ইউরো'-সংকট এর চটজলদি কোনও সমাধান কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সমাধানের সন্ধান চলছে— সময় পেলে সুবিধা হবে।

বর্তমানে ছোট ছোট দেশ— গ্রীস, পর্তুগাল এবং আয়ারল্যান্ডকে সাহায্যের প্যাকেজ দিয়ে অর্থসংকট থেকে বের করে আনার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ইতালি, স্পেনের মতো বড় দেশের সমস্যা সমাধানের পথ ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে নেই। যদি সকলে একই ইউনিয়নে থাকতে চান তাহলে বাজেটে ছাঁটাই করতে হবে, খরচ কম করতে হবে। এরকম করলে তাদের নিজ দেশবাসীর বিরাগভাজন হতে হবে। আর যদি ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব মুদ্রায় ফেরত আসে তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপে পড়তে হবে। নিত্য আবশ্যক জিনিসপত্রের চাহিদা পূরণ করা কঠিন হয়ে যাবে। সংকটগ্রস্ত দেশগুলো ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানসিকভাবে দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে। দ্রুত। জাতীয়তাবাদের দোহাই পাড়ছে। গণতন্ত্রে জাতীয়তাবাদ প্রবল হবে, সংকটাপন্ন দেশ ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাবে। ■

(লেখক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট প্রফেসর)

নেত্রদান মহাদান

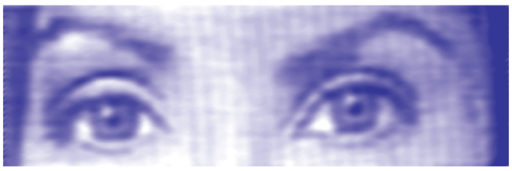

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

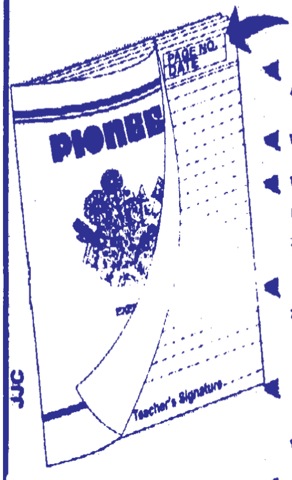

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

নবাঙ্কুর

জল নিয়ে ভাবনা

জলের অপচয় বন্ধ করল ছোটোরা

পাড়ায় জল নিয়ে ঝগড়া লেগে থাকে। রোজই কমবেশি হয়। এসব ভেবেই কাছাকাছি কল বসিয়ে বলা হয়েছে 'জলের অপচয় বন্ধ করুন'। কথাটা কারও কাছে গুরুত্ব পায়। কেউ কেউ আমল দেয় না। যে যতটা পারে জল নেয়। সকাল থেকে যতবার জল আসে কেউ কেউ প্রত্যেকবার নেয়। অল্প সময় নয়। আধঘণ্টা করে চারবার বরাদ্দ। নেয় তারও বেশি। কল ফাঁকা থাকলেই কোনও-না-কোনও জিনিস বসিয়ে দেবে। বালতি হাঁড়ি ডেকচি। এছাড়া একটার পর একটা বোতলে জল ভরা তো আছেই। কেউ যদি বলে, 'আপনারা তো অনেক জল নিয়েছেন, অন্যদের নিতে দিন', সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। ঝগড়ার সময় তালজ্ঞান থাকে না। ঝগড়া চলতে থাকে কলের জল বন্ধ হওয়ার পরেও। কোনও কোনও বাড়ির সকলে মেতে ওঠে ঝগড়ায়। ছেলেছোকরারা মজা পায়। বলে 'ওদের খাবার হজম হয় না ঝগড়া না করলে।' কেউ কেউ বলে, 'তোমরা কত জল পেলে খুশি হয়ে ঝগড়া বন্ধ করবে বলো তো?' প্রত্যেকের বাড়িতে বড় বড় চৌবাচ্চা আছে। তাতে ধরা থাকে জল। তাছাড়া অনেক পাত্রে জল ভরা থাকে। অত জল কাজে লাগে না। সকালবেলা সেই জল ফেলে দিয়ে নতুন করে জল ভরা চাই। পাড়ার ছেলেরা বলল, 'এও তো জলের অপচয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার রান্না করে ফেলে দিচ্ছো না। জল বিনা পয়সায় মিলছে বলে যত খুশি ধরা ফেলায় আপত্তি নেই। পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানীয় জল তৈরির খরচ তো আছে। সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?'

পাড়ার তরুণরা উদ্যোগ নিল— এভাবে জলের অপচয় বন্ধ করার জন্যে। কোনও বাড়ি প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল নিয়ে অপচয় করতে পারবে না। যাঁরা জল রোজ ধরছেন তা দিনের মধ্যে ব্যাবহার করতে না পারলে পরের দিন কাজে লাগাবেন। কেউ কেউ যত খুশি জল ব্যবহার করেন স্নান কাচাকাচির জন্যে। কতটা জল একটা পরিবার ব্যবহার করতে পারে সেটা ঠিক না হলে জলের অপচয় বন্ধ করা যাবে না। চাহিদা কারও কম, কারও বেশি। অনেকের চাহিদার কোনও সীমা থাকে না। তাদের দখলদারি মনোভাবের জন্যে প্রচুর জল নষ্ট হচ্ছে। পাড়ার তরুণরা বলল— 'কলে জল আসছে বলে যত খুশি নিতে হবে— এমন ধারণা যাঁদের, তাঁদের ভুল ভাঙা দরকার। মনে রাখবেন, বহু মানুষ এখনও প্রয়োজনের জলটুকু পায় না। একদল লোক যতখুশি জল খরচ করে যাবে, আরেকদল রান্না খাওয়া চান আর অন্য কাজের সময় হাহাকার করবে জলের জন্যে। আগামীদিনে ভয়ঙ্কর জলসঙ্কট দেখা দেবে, যাঁরা আজ দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে জল নষ্ট করছেন তাঁরা কোনও সময়েই সেই ভয়ঙ্কর ছবিটা অনুমান করতে পারছেন না।' বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলা আর বোঝাবার চেষ্টা চলল। পাড়ার গলিতে পার্কে পোস্টার প্রদর্শনী হলো। দেখানো হলো তথ্যচিত্র। ছোটোদের ভালো করে বোঝানো হলো। তারা বলবে বড়োদের। প্রথমদিকে কাজ হয়নি তেমন। তারপর দেখা গেল কাজ হয়েছে। যারা জলের বাতিকে হরদম জল নষ্ট করত তারা দিনে একবারের বেশি কলের ধারে আসছে না। বাড়িতে বাড়িতে জল জমানো আর ফেলার নিত্যখেলা বন্ধ হয়েছে। প্রত্যেকের প্রয়োজন মিটিয়েও জল থাকছে। পাড়ার ছেলেরা একটা বড় জলাধার তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছে। বাড়তি জল সেখানে থাকবে। প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। জলাধারের জলকে কেউ বাসি জল বলতে পারবে না।

কৌশিক গুহ

অন্য বার্তা

শব্দ দূষণে গান হারালো চড়ুই

শব্দ দূষণের জন্যে চারপাশে অনেক অদল বদল ঘটছে— এটা তো বিজ্ঞানীরা বারবার বলছেন। পাখিদের উপর দূষণের প্রভাব পড়ছে। পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বহু পাখির আওয়াজ কমে গেছে বা থেমে গেছে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পাঁচ দশক ধরে গবেষণা করেছিলেন স্প্যারোদের গানের প্রশংসা অনেকেই করেন, কিন্তু তাদের থেকে গান ভুলিয়ে নিতে চেয়েছে কারা? বিজ্ঞানীরা যুক্তিতথ্য প্রমাণ ছাড়া কথা বলেন না। তাঁরা আঙুল তুলে দোষীকে চিহ্নিত করেছেন— শব্দ দূষণ।

বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন স্প্যারোরা তিনটি ভিন্ন স্বরে গান করত। প্রায় তিন দশক ধরে আমেরিকার অনেক শহরেই শব্দের মাত্রা বাড়ে। তার ফলে স্প্যারোরা তিনটি স্বরের মধ্যে সব থেকে উঁচু স্বর বেছে নেয়। বাকি দুটি স্বর বিলুপ্ত হয়ে যায় এর ফলে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের বেপরোয়া আচরণে যেভাবে দূষণ বাড়ছে তাতে প্রকৃতির অনেক রকম ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ওঁরা বলেছেন সব স্তরে সচেতন হওয়া জরুরি।

বার্তাবহ

পাড়ার লাইব্রেরি

বইপড়ার টানেই লাইব্রেরিতে যাওয়া

বই পড়ার ঝোঁক কমে যাচ্ছে— এটা অনেকেই বলছে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গেলেই সেটা বোঝা যায়। পাড়ার লাইব্রেরিতে আগে হাজির হোত অনেকেই। এ বই সে বই নাড়াচাড়া করত। পুরনো বই দেখত, নতুন কি কি বই এলো দেখে নিত। বই নিয়ে কথা বলার লোকজন ছিল অনেক। বড়োরা উৎসাহ দিতেন পড়ায়। সমিত লাইব্রেরিতে যেত মায়ের বই আনার জন্যে। মা একটার পর একটা বই চটপট পড়ে নিত। কখনও কখনও লাইব্রেরিতে বই কিনেও দিয়েছে। লাইব্রেরিয়ান একদিন বললেন, 'মায়ের জন্যে বই নিয়ে যাও। তোমার জন্যে নিয়ে যাও না কেন?' সমিত বলল, 'আমি বাড়ির বই পড়ি। আর আমি তো মেম্বার নই।' লাইব্রেরিয়ান বললেন 'তুমি মেম্বার হয়ে যাবে। সারা মাসে যারা সবচেয়ে বেশি বই নেয়, তাদের আমরা উপহার দিই একটা কার্ড। পাঠককে শুভেচ্ছা জানানো হয়। যারা পরপর তিনমাস ওই রকম কার্ড পায় তাদের বই নেওয়ার জন্যে কোনও টাকা জমা রাখতে হয় না। আর সারা বছরে আটবার কার্ড পায় যারা, তাদের দুমাসের চাঁদা দিতে হয় না।'

পরদিনই সমিত সদস্য হয়ে গেলো লাইব্রেরির। সপ্তাহে তিন দিন লাইব্রেরিতে যেত। মায়ের বই পাল্টাতে। নিজের বই নিত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দেখত। লাইব্রেরিতে টেকসট বই রাখার ব্যাপারটা পছন্দ নয় সমিতের। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে পড়ার বই স্কুলেই থাকবে। সেখানকার লাইব্রেরি প্রয়োজন মেটাবে। সাধারণের জন্যে যে লাইব্রেরি সেখানে অন্যান্য বই থাকবে। যা প্রত্যেকের কাজে লাগবে। লাইব্রেরিয়ান মেনেছেন সমিতের যুক্তি। তিনি ঠিক করেছেন, 'লাইব্রেরিতে আর টেকসট বই কেনা হবে না।' অনেকে আপত্তি জানালেও তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বদল করেননি।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. রবীন্দ্রনাথের দুই পুত্রের নাম? কোন্ পুত্রের মৃত্যু হয় কিশোর বয়সে?

২. রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কোন্ সংস্থা তাঁর নাটকের মঞ্চরূপ দেন সার্থকভাবে? সংস্থার প্রধান পুরুষ কে ছিলেন?

৩. সরকারি উদ্যোগে প্রথম রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া কোন সময়ে? এই উদ্যোগে কার সক্রিয় ভূমিকা ছিল?

৪. 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী' গানটির গীতিকার ও সুরকার?

৫. 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, এমন শক্তিমান' এই গানটি কার লেখা? সুর দিয়েছিলেন কে?

উত্তর : ১. জ্যেষ্ঠ : রথীন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ : শমীন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ পুত্রের। ২. বহুরূপী। শম্ভু মিত্র। ৩. জন্মশতবর্ষে ১৯৬১ সালে। বিধানচন্দ্র রায়। ৪. অতুলপ্রসাদ সেন। ৫. রবীন্দ্রনাথের। সুর তাঁরই।

ছোটোদের বলছি

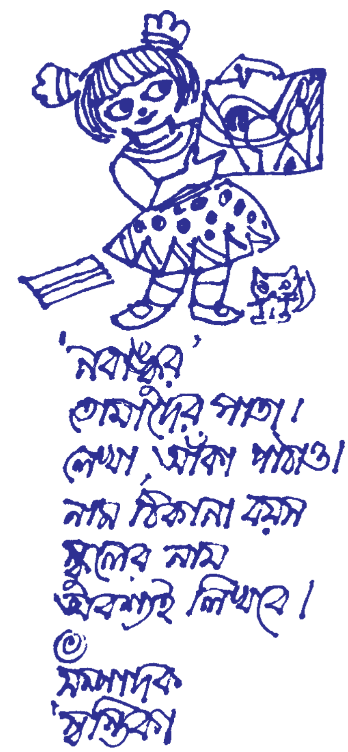

উলটো পালটা

স্বরলিপি দেখে গান শেখান গানের দিদিমণি শাশ্বতী রায়। সেদিন স্বরলিপি ছিল না। একটা 'গীতবিতান' নিয়ে এসেছিলেন। বিশ্বভারতীর বই নয়। অন্য এক প্রকাশকের বই। বিশ্বভারতীর বইয়ের দাম বেশি বলে অন্য সংস্থার প্রকাশ করা 'গীতবিতান' কম পয়সায় আনা হয়েছিল। গান শুরু হলো। বই দেখে দেখে গাওয়া 'আমারে তুমি অশেষ করেছো, এমনই শীলা তব।' গানটা কানে গিয়েছিল পাড়ার এক প্রবীণার। তিনি বললেন, 'কি গাইছো ভুলভাল! ঠিক করে বই দেখে শেখো।'

একটা মেয়ে বলল, 'আমরা ঠিকই শিখেছি। এই দেখুন বইয়ে ছাপা আছে।' সে বইটি মেলে ধরল প্রবীণার সামনে। তাতে স্পষ্ট ছাপা 'আমারে তুমি অশেষ করেছো, এমনই শীলা তব।' প্রবীণা দেখে কিছু না বলে গম্ভীর মুখে চলে গেলেন। ভাবলেন, দিনে দিনে লীলা বদলে শীলা হবে।

২.

মজুমদারদের জুতোর দোকানের নাম 'পায়ে

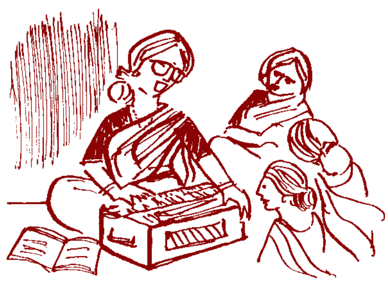

রাখুন'। রোজ সন্ধ্যেবেলা দোকান বন্ধ করে ফেরার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়।

বন্ধু জিজ্ঞেস করে, 'আজকাল কেমন চলছে ব্যবসা?'

জুতো ব্যবসায়ী জানায়, 'একদম খারাপ।' কারণ ব্যাখ্যা করে বলে, 'পরশু সারা দিনে স্রেফ এক জোড়া বিক্রি হয়েছে। কাল কিছুই বিক্রি হয়নি। আজ তো অবস্থা আরও খারাপ।'

'কেন কি হয়েছে?' বন্ধুর প্রশ্ন।

'পরশু যে একজোড়া জুতো বিক্রি হয়েছিল, আজ তার ক্রেতা ফেরত দিয়ে গেলো।'

রামগরুড় সংকলিত

চিঠিপত্র

মমতার শাহরুখ প্রীতি

একে কী বলা যায়, হুজুগের বাঙালি, নাকি বাঙালির হুজুগ? তবে যে কথাটিই প্রযোজ্য হোক না কেন, হুজুগ রয়েছে একশ্রেণীর বাঙালির রক্তে। তাই খেলা হোক, উৎসব হোক বা রাজনীতি হোক, হুজুগে মাতা চাই। এবং অতিমাত্রায়। তা না হলে এবারের আই পি এল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স (কে কে আর)-কে কলকাতায় সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে একশ্রেণীর যুবক-যুবতী, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কিছু মন্ত্রী এবং তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা কিছুক্ষণ কলকাতাকে অচল করে রেখে যেভাবে উন্মাদনায় মাতলেন তা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। অভূতপূর্ব এই কারণে যে ইতিপূর্বে ক্রিকেট তো দূরে থাক, ক্রীড়া সংগঠনগুলির কোনও বিজয়ীদলকে সংবর্ধনা জানাতে মাঠে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে টানাটানির ঘটনা ঘটেনি, যা অত্যন্ত বিসদৃশ।

আই পি এল (ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ) একটি বেসরকারি ক্রিকেট সংস্থা। এই সংস্থার সদস্য বেশ কয়েকটি ক্রিকেট দল। এমনই একটি দল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কে কে আর)। কে কে আরের মালিক বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান। তবে নামে কলকাতা নাইট রাইডার্স হলেও এটি মোটেই কলকাতার দল নয় এবং এর মালিক ও সব ক্রিকেটারও কলকাতার নন। তাহলে প্রশ্ন, কে কে আরকে নিয়ে এ রাজ্যে এত মাতামাতি কেন? আসল কারণ হচ্ছে, শাহরুখ হচ্ছেন মমতা সরকারের মনোনীত পশ্চিমবঙ্গের ব্রান্ড অ্যামব্যাসাডর। অবশ্য শাহরুখকে এই পদে বসানোর কারণও আছে। সেটা অবশ্যই রাজনৈতিক। মমতা হচ্ছেন একজন প্রথম শ্রেণীর মুসলিম তোষক বা সেকুলারবাদী রাজনীতিক। তিনি মুসলিম তোষণের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং এখনও দেখাচ্ছেন তা সর্বজনবিদিত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম তোষণের উদাহরণ— ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতা প্রদান। মমতা সার বুঝেছেন, ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে হলে মুসলিম ভোট চাই-ই চাই। তাই মুসলিমদের মন জয় করতে শাহরুখকে করেছেন রাজ্যের ব্রান্ড অ্যামব্যাসাডর। কিন্তু কে এই শাহরুখ? ৯৩-এর মুম্বই বিস্ফোরণের পান্ডা ও একদা রুপালি জগতের 'ডন' দাউদ ইব্রাহিমের বলিউড শাসনকালে যে তিন খানের (শাহরুখ, আমির ও সলমন) আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের অন্যতম এই শাহরুখ খান। সে সময় দাউদের কথাই ছিল বলিউডে শেষ কথা। তার নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন সিনেমার পরিচালক-প্রযোজকরা। তখন কোন্ ছবিতে কে নায়ক ও কে নায়িকা হবেন তা ঠিক করে দিত দাউদ। তাই দাউদের 'গুড বুক'-এ থাকতে অধিকাংশ উঠতি নায়ক-নায়িকা দাউদ মনোরঞ্জনে তন-মন উজাড় করে দিতেন। প্রায় প্রত্যেক ছবি নির্মাতাকে দিতে হোত দাউদকে বড় অঙ্কের হিস্যা। শোনা যায়, মুসলিম হওয়ার সুবাদে ওই খানদের প্রতি দাউদের সহানুভূতি ছিল প্রবল এবং বলিউডে খান সাম্রাজ্য বিস্তারে তার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তবে একথাও ঠিক, খানেরা তাঁদের প্রতিভাবলেই আজ বলিউডে বিখ্যাত। তাই তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। দাউদ ভারত ছেড়ে পালালেও পাকিস্তান ও দুবাই থেকে সে বলিউডকে আজও নিয়ন্ত্রণ করছে তার এদেশীয় চেলা-চামুণ্ডাদের মাধ্যমে। শাহরুখের স্ত্রী গৌরী হিন্দুর কন্যা। সিনেমা ও ব্যবসা করে এখন বহু কোটি টাকার মালিক। বর্তমানে কে কে আরেরও মালিক। ভদ্রলোকদের ক্রিকেট-জুয়ায় লগ্নি করেছেন কোটি কোটি টাকা। লাভের ফসলও তুলছেন দু'হাতে। কিছুদিন আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে কে কে আরের জয়ে আনন্দে মাতোয়ারা মদ্যপ শাহরুখ মারধর করেন এক নিরাপত্তা কর্মীকে। তার শাস্তি স্বরূপ ওয়াংখেড়ের দরজা তাঁর সামনে পাঁচ বছরের জন্য বন্ধ। খবরে প্রকাশ, কলকাতা পুরসভার প্রাপ্য কয়েক লক্ষ টাকা কর আজও মেটাননি তিনি। কয়েক মিনিটের একটি রাজ্য সরকারের অ্যাড-ফিল্ম নির্মাণ করতে তাঁর খরচ হয়েছে নাকি দু' কোটি টাকারও বেশি। কাজেই এহেন এক 'বিতর্কিত' ব্যক্তিকে রাজ্যের ব্রান্ড অ্যামব্যাসাডর পদে বসিয়ে তাঁর পিছনে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ এবং বেসরকারি আই পি এল জয়ী 'কে কে আর' কে সরকারি খরচে সংবর্ধনা জানানোর পেছনেও রয়েছে সেই মুসলিম তোষণের রাজনীতি। রাজ্যের রাজকোষে নাকি 'ভাঁড়ে মা ভবানী'! তা সত্ত্বেও শাহরুখের দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে লকেট সহ সোনার হার উপঢৌকনের টাকা কোথা থেকে আসছে? তাছাড়া আই পি এলে বহু কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন চলছে বলে কথা উঠেছে এবং বেনামে ডি-কোম্পানির টাকা খাটছে বলে শোনা যাচ্ছে। কাজেই এহেন দুর্নীতিবাজ সংস্থাকে নিয়ে মমতার মাতামাতি অনেকেই দেখছেন সন্দেহের চোখে। তাদের প্রশ্ন, তবে কী ডালমেঁ কুছ কালা হ্যায়? রাজ্য যখন খরায় জ্বলছে, ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মরছে, দেনার দায়ে চাষি আত্মহত্যা করছে, রাজ্য জুড়ে শোনা যাচ্ছে অনুন্নয়ন ও নৈরাজ্যের পদধ্বনি, তখন কলকাতার বুকে শাহরুখের দলকে নিয়ে মমতাদের নাচানাচি রাজ্যের মুখে মেখে দিয়েছে চুনকালি। জনসমর্থনের পারা যখন নিম্নমুখী তখন মমতার পক্ষে এমন হুজুগের প্রয়োজন ছিল বৈকী—!

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

ইমাম ভাতা

৩ এপ্রিলের পর এক মাসের মাথায় ২রা মে, মোয়াজ্জিনদেরও মাসিক ১০০০ টাকা ভাতা এবং সমস্ত মুসলিম গোষ্ঠীকে সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে এলেন।

পশ্চিমবঙ্গে ইমাম ভাতা চালু হলে, ভারতের সব রাজ্যেই এই ভাতা চালু হবে। সারা ভারতে কম করে ১০ লক্ষ মসজিদ আছে। মসজিদ পিছু বছরে ২৫০০+১০০০×১২=৪২০০০ টাকা হিসাবে ১০ লক্ষ মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা দিতে হবে ৪২০০ কোটি টাকা। তার সঙ্গে যোগ হবে তাদের জন্য বিনা পয়সায় জমি বাড়ি ও সন্তানদের চিকিৎসা ও শিক্ষার বিপুল ব্যয়।

মহামতি রাজীব গান্ধী যুগান্তকারী 'মুসলিম মহিলা বিল' পাশ করেছিলেন। মুসলিমরা ৪টা পর্যন্ত বিয়ে করবে আর তালাক দেবে। তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের খোরপোষ দেওয়া হবে হিন্দুদের করের টাকায়। যেমন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা : মদ খেয়ে, মরে গেলেও দু'লাখ টাকা পাবে। কেন্দ্র সরকার হজযাত্রার ভরতুকি দিতে এবং হজযাত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা প্রতিনিধি পাঠাতে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেন। সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছেন এই ব্যয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। (৯.৫.১২ বর্তমান ৫ পাঃ) তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমাম ভাতা। হয়তো এজন্য "গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস" এ-তাঁর নাম উঠবে। নাম উঠুক বা না উঠুক দেশটা ইসলামিকরণের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত ভাবে এই অসাংবিধানিক এবং অনৈতিক নগ্ন মুসলিম তোষণের তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত।

—অম্বিকা প্রসাদ পাল, ঘোলা বাজার, কলকাতা।

কেরলে একের পর এক খুনে অভিযুক্ত সি পি এম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেরলে রাজনীতির পালাবদল শুরু হতেই বামমার্গী কমরেডকুলের নার্ভাস সিস্টেমে গণ্ডগোল দেখা দিতে শুরু করেছে। একবছর আগেও এই ক্ষুদে লেনিন, স্ট্যালিন, চেসেস্কুরা রাজ্যের মানুষের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। ইদানীং বেশ কিছু সিপিএম কর্মী আইন- রক্ষকদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। খুনের মামলাগুলোর যতই নতুন করে শুনানি শুরু হচ্ছে; ততই বড়, মেজো, সেজো কমরেডরা গারদে ঢুকছেন, ঢোকার ভয়ে কাঁপছেন। চারবছর আগে দলত্যাগী (সিপিএম) বিপ্লবী কমরেড যুবক মুসলিম লীগ কর্মীকে হত্যার জন্য বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট সিপিএম নেতা জেলে যায় এবং বাকিরা গ্রেপ্তার এড়াতে গা ঢাকা দেয়। আরও একদল কমরেডকে তাদের কৃতকর্মের প্রেতাত্মা তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত কন্নুর কেরলের মার্কসবাদীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে পরিচিত ছিল। তারা তাদের বিরোধীদের ইচ্ছা করলেই হত্যা করতে পারত। দলতন্ত্রের বশংবদ পুলিশ এমনভাবে মামলা সাজাত যে, আদালতে সবাই বেকসুর খালাস পেয়ে যেত। বামপন্থী রাজ্য সরকারের পেশীশক্তি ও পুলিশ শক্তির সমন্বয় এতটাই পাকাপোক্ত ছিল।

সেই চেনা জগৎটাই বদলে গিয়েছে গত ৪ মে কোঝিকোড় জেলায় বিদ্রোহী কমরেড

এম এম মানি

অশোকন

টি কে রাজেশ

কৃষ্ণন

টি পি চন্দ্রশেখরণের হত্যার পরে। এই নির্মম হত্যায় কেরলবাসীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। প্রথম সারির মার্কসবাদী নেতারা দেওয়ালের লিখন পড়তে ব্যর্থ।

ইতিমধ্যে সাতজন মাঝারি ও টপ্ মার্কসবাদী নেতা ওই নির্দয় হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে সামিল থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন। দেহ খুঁজে পাওয়ার পর মুখে ও গলায় ৫১টি গভীর ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেছে। এছাড়া অন্যত্রও ক্ষত ও আঘাতের চিহ্ন আছে।

তবে কমরেডদের যেটা সবচেয়ে চিন্তায় ফেলেছে তা হলো পুলিশ পুরনো মামলার ঝাঁপি পুনরায় খুলতে শুরু করেছে। বিশেষত, যেসব ক্ষেত্রে লাল-ছক মোতাবেক হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। যুব মোর্চা নেতা কে টি জয়কৃষ্ণণ ১৯৯৯ সালে কান্নুর-এ খুন হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে মুখ খুলেছেন সিপিএম-এর নির্দেশে হত্যাকাণ্ডের ছক রচনাকারী সমাজবিরোধী টি কে রাজেশ।

রাজেশ-এর মতে, সাতজন হত্যাকারীর মধ্যে মাত্র ১ জনের নামই পুলিশ অভিযুক্তের তালিকায় রেখেছিল। বাদবাকিটা সিপিএম নেতাদের নির্দেশমতো হয়েছিল। তার আরও বক্তব্য— শিক্ষক জয়কৃষ্ণনকে যখন হত্যার করা হয় জনৈক সিপিএম নেতার নির্দেশে তখন তিনি ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। তাঁদের সামনেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

যে মার্কস্‌বাদী নেতার ঘুম ছুটে গিয়েছে তিনি হলেন সিপিএমের কন্নুর জেলা সম্পাদক পি জয়রাজন। অপরপক্ষ তাঁকে অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড বলে উল্লেখ করছেন।

জয়রাজন আবার তালাসেরির মুসলিম যুবক মহম্মদ ফজল হত্যাকাণ্ডে যুক্ত— দলের দুই নেতা কারাইরাজন এবং কারাই চন্দ্রশেখরণকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অপরাধী। ফজল হত্যা হয়েছিল ২০০৬-এর অক্টোবরে। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। সিবিআই হাইকোর্টকে জানিয়েছে যে, ওই দুজনকে সি পি এমের হস্তক্ষেপের জন্য গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না।

ফৌজদারী আদালতের কাঠগড়ায় কমরেডকুল

- সি এইচ অশোকন : এলাকা সম্পাদক—গ্রেপ্তারকৃত
- কে কে কৃষ্ণন : এরিয়া কমিটি সদস্য—গ্রেপ্তারকৃত
- পি পি রামকৃষ্ণন : এরিয়া কমিটি সদস্য—গ্রেপ্তারকৃত
- ইউ ভি ভেনু : লোকাল কমিটির সম্পাদক—গ্রেপ্তারকৃত
- মনোজ : শাখা কমিটির সম্পাদক—গ্রেপ্তারকৃত
- রবীন্দ্রণ : লোকাল কমিটির সদস্য—গ্রেপ্তারকৃত
- কে সি রামচন্দ্রণ : লোকাল কমিটির সদস্য—গ্রেপ্তারকৃত
- জ্যোতিবাবু : লোকাল কমিটির সদস্য—গ্রেপ্তারকৃত
- এম এম মানি : প্রাক্তন জেলা সম্পাদক—তদন্তের মুখোমুখি
- পি জয়রাজন : জেলা সম্পাদক—নোটিশ ধরানো হয়েছে।
- টি ভি রাজেশ : বিধায়ক ও ডি ওয়াই এফ আই নেতা—নোটিশ ধরানো হয়েছে।
- পি কে কুন্নানাথন : এরিয়া কমিটি সদস্য—গা-ঢাকা দিয়েছেন।
- কারাই রাজন : জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য— গা-ঢাকা দিয়েছেন।
- চন্দ্রশেখরণ : লোকাল কমিটির সম্পাদক—গা-ঢাকা দিয়েছেন।

কেবলমাত্র ওই দুজন নেতাকেই যে খোঁজা হচ্ছে তা নয়, পুলিশ দক্ষিণপূর্ব কেরলের ইদ্দুকি জেলার কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের মামলা আবার নতুন করে শুরু করছে। এ বিষয়ে দলের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে সদ্য বাদ পড়া এম এম মানিও জানিয়েছেন—সিপিএম তার বিরোধীদের নিয়মিতভাবে নিকেশ করত। গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে মানি হাইকোর্টে নিজেকে নির্দোষ বলে সব মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে আবেদন জানিয়েছেন। মানির বিরুদ্ধেও এফ আই আর হয়েছে।

উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী যে, তাঁরা হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত রাঘব-বোয়ালদের ফাঁদে ফেলে সরকারকে দৃঢ়হস্তে মোকাবিলার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

মুসলিম লীগ কর্মী আবদুল শুকুর কান্নুর-এ গত ২০ ফেব্রুয়ারি নিহত হয়েছিলেন। কেরল পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) সিপিএমের জেলা সম্পাদক পি জয়রাজন এবং দলীয় বিধায়ক এবং ডিওয়াই এফ আর-এর রাজ্যসভাপতি টি ভি রাজেশকে হত্যাকাণ্ড নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে। পট্টুবম-এ জয়রাজন ও রাজেশের গাড়ীর উপর পাথর ছোঁড়ার অপরাধে প্রকাশ্য দিবালোকে দলীয় আদালতে শুকুরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে সিট (SIT)-ও জয়রাজন এবং রাজেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম-এর লোকাল কমিটির সম্পাদক ইউ ভি ভেনুর জবানবন্দীর ভিত্তিতেই। পুলিশেরও বিশ্বাস জয়রাজনই শুকুরকে শেষ করার আদেশনামায় সই করেছিল। সিপিএমের কান্নুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলী তাদের দুই নেতাকে নোটিশ পাঠানোর পদ্ধতির সমালোচনা করেছে। তারা বলেছে, নোটিশের খবর আগাম সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করা হয়েছিল। ■

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

রোঁলাগারোয় অপ্রতিহত নাদাল রথ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্রান্সের রোঁলাগাঁরো ফিলিপ মাতিয়ের কোর্টকে যেন ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন রাফায়েল নাদাল। আটবার খেলে সাতবার চ্যাম্পিয়ন, অবিশ্বাস্য রেকর্ড। ২০১২-র ফরাসী ওপেনের ফাইনালে সাধিয়ার নেভিকে ডকোভিচকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবাদপুরুষ বিয়ন বর্গের রেকর্ড ভেঙে দিলেন স্পেনীয় যুবক। বোদ্ধামাত্রেই বিস্ময়ে আবিষ্ট। এঁদের অধিকাংশই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন শুধুমাত্র অল কোর্ট কভারিং ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের জোরেই অন্যান্য কোর্টেও নিজের ক্ষমতাবৃত্ত গড়ে তুলবেন নাদাল। তাঁর পক্ষে ১৬-১৭টি গ্র্যান্ডস্লাম জয় করা কোনও কঠিন কাজই নয়। আর ফেডেরারের পক্ষে নাদাল-ডকোভিচকে টপকে কোনও গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব জেতা সম্ভব নয়। তাঁর বয়স

বর্গ ৬ বার ফরাসী ওপেন জিতেছিলেন। নাদাল জিতলেন ৭ বার।

এই মুহূর্তে নাদালের যা বয়স, ফর্ম ও খিদে তাতে আরও ২/৩টি ফরাসী ওপেন খেতাব জিতবেন ধরে নেওয়া যায়। যেহেতু তিনি ক্লে কোর্টের গ্রেট মাস্টার। তাই রোঁলাগাঁরোর লাল সুরকির কোর্টে আরও ২/৩ বছর অপ্রতিহত গতিতে ছুটবে নাদাল রথ, ধরে নেওয়া যায়। এই খেতাবটি জেতার মাধ্যমে কেরিয়ারে ১২টি গ্র্যান্ডস্লাম জেতা হয়ে গেল নাদালের। বিয়ন বর্গ, রড লেভার, রয় এমার্সনের সঙ্গে একাসনে স্প্যানিশ আর্মাডা নাদাল। তবে বাংলার বিশ্বখ্যাত টেনিস ব্যক্তিত্ব জয়দীপ মুখার্জি বলে দিয়েছেন নাদালের পক্ষে রজার ফেডেরারের ১৬টি গ্র্যান্ডস্লাম খেতাবের রেকর্ড ভাঙা সম্ভব নয়। কারণ হার্ডকোর্ট ও ঘাসের কোর্টে ক্লে কোর্টের দাপট দেখাতে পারেন না তিনি।

নাদালের এখন বয়স ২৭। অন্তত ৩০/৩২ বছর পর্যন্ত টেনিস কোর্টে বিচরণ করবেন নাদাল তা বলে দেওয়া যায়। ক্লে কোর্টের মত স্বচ্ছন্দ বা সাবলম্বী অন্যধরনের কোর্টে ততটা না হলেও নাদালের অ্যাথলেটিক দক্ষতা ও সার্ভিস-ভলির অসাধারণ যুগলবন্দী দেখে আবিশ্ব টেনিস হয়েছে, কোর্টে তাঁর ঈর্ষণীয় রিফ্লেক্সে টান ধরেছে। ক্লে কোর্ট ও হার্ড কোর্টে পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াইয়ের ধকল নেওয়া সম্ভব নয়। তবে ঘাসের কোর্টে উইম্বলডন আরও একবার জিততেও পারেন। কারণ ঘাসের কোর্টের উপযোগী সার্ভিস এবং নেটের কাছে এসে 'চিন অ্যান্ড চার্জ' টেনিস এখনো অটুট আছে তাঁর।

ডকোভিচ, পুয়ান মার্টিন ডেল পোর্তো, অ্যান্ডি মারে, ডেভিড ফেরার, জো উইলফ্রেড, সঙ্গা-রাই নাদালের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের সবার থেকেই নাদাল এগিয়ে তার কোর্ট জুড়ে খেলার ক্ষমতা ও শেষ পয়েন্ট পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পবদ্ধতার জন্য। পিক পয়েন্টে 'আনফোর্সড এরর' কম করেন। প্রথম সার্ভিস শতকরা ৯০ ভাগ ঠিকঠাক পড়ে। গ্রাউন্ড স্ট্রোকে রয়েছে প্রচণ্ড পাওয়ার ও বৈচিত্র। এই গুণগুলিই নাদালকে এগিয়ে রেখেছে সমসাময়িক সব প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায়। তবে ডকোভিচকে হাল্কাভাবে নিলে ভুল করবেন নাদাল। সাধিয়ার ছেলেটিকে দেখে বোঝা যায় না তার তূণে কোন অস্ত্র মজুত রয়েছে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তা কিভাবে প্রয়োগ করবেন। নাদালের অশ্বমেধের ঘোড়ার লাগাম পরাতে পারেন একমাত্র তিনি।

খেলা

মহেশ-সানিয়ার দ্বিতীয় গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। মহেশ ভূপতি-সানিয়া মির্জার মিক্সড ডাবলস জুটি দ্বিতীয় গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব জিতে নিলেন প্যারিসের মাটি থেকে। ২০০৯-এ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর একবছর সদ্য সমাপ্ত ফরাসী ওপেন খেতাব ভারতে এল তাঁদের টেনিস

বিক্রমে। আসন্ন লন্ডন অলিম্পিকেও এই জুটির কাছে পদক প্রত্যাশী আপামর ভারতবাসী। তাঁদের জুটির মধ্যে যে সমন্বয় ও পরস্পরের পরিপূরক হয়ে খেলার প্রবণতা রয়েছে, তা লন্ডনের ঘাসের কোর্টের পক্ষে মানানসই। তাই স্বপ্ন দেখা অমূলক নয়। লিয়েন্ডার পেজই টেনিসে একমাত্র অলিম্পিক পদকজয়ী। লন্ডন অলিম্পিক হবে লিয়েন্ডারের ষষ্ঠ অলিম্পিক, সম্ভবত মহেশ ভূপতির জুড়িদার হিসেবে। কয়েকদিন আগেই বিশ্বনাথন আনন্দ পঞ্চমবারের মতো দাবার বিশ্বখেতাব জিতেছেন। তার পরপরই ফরাসী ওপেনে মহেশ-সানিয়ার জয়লাভ ভারতীয় ক্রীড়াসমাজকে বিশ্বমঞ্চে গৌরবময় অবস্থানে তুলে এনেছে। টেনিস সব অর্থেই বিশ্বজনীন-সার্বজনিক ইভেন্ট। গ্লামার, মর্যাদা, জনপ্রিয়তা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডে দুনিয়ার সর্বত্র উচ্চ কোর্টের খেলা বলে গণ্য হয়। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় সিনেমা ও সঙ্গীত জগতের তারকাদের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা আদায় করে নেন টেনিস তারকারা। তাই মহেশ-সানিয়া বহির্বিশ্বে রীতিমতো সম্মানীয় ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। লন্ডন অলিম্পিকের সময় গোটা বিশ্বসমাজের চোখের আলোয় বিরাজ করবেন মহেশ-সানিয়া। ভারতীয় হিসেবে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে? পদক আসুক না আসুক।

‘ভক্তি-ক্ষীর’ ও ‘জ্ঞান-মিশ্রী’ সহযোগে ক্ষীর-সমুদ্রে অবগাহন

পুস্তক প্রসঙ্গ

শ্রীভিক্ষুদেব ভট্ট

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (২য় খণ্ড)। ৯০৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে ১০টি বিভাগ---বেদ-বেদান্ত ও দর্শন, তন্ত্র ও মাতৃসাধনা, রামায়ণ ও মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব দর্শন, শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু ও পরিকর, বিবিধ, মহাজীবন স্মরণে, ভূমিকা ও শুভেচ্ছা বাণী এবং ইংরাজী রচনা বিভাগ।

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ডের) পরিচয়ে ছিল ক্ষীর সমুদ্রের এক এক অঞ্জলি যেখান থেকেই নেওয়া হোক না কেন সর্বত্রই তার একই স্বাদ। ওই একই ধারায় দ্বিতীয় খণ্ডটিও ‘ভক্তি-ক্ষীর’ এবং ‘জ্ঞান-মিশ্রী’ সহযোগে এক ক্ষীর-সমুদ্র। শ্রীমহানামব্রতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা রচনাগুলি সংকলন ও গ্রন্থন করে বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী সর্বজনের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। সুলভ করেছেন এই ‘ক্ষীর’ আস্বাদনের। আমরা পূর্বেই দেখেছি জ্ঞান-ভক্তি ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ, বহু ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞাতা শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির লেখনীমুখে অতি গূঢ় তত্ত্বও সহজ সরল প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পরিস্ফুট হয় তাঁর বহুমুখী প্রতিভা।

বেদ-বেদান্ত ও দর্শনের এক বিহঙ্গম-দৃষ্টিতে অবলোকনের সুযোগ তিনি এনে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘নৌকাডুবি’ উপন্যাসের আলোচনায় ‘বৈষ্ণব-বেদান্তের মর্মকথা’ ব্যাখ্যা এক অভূতপূর্ব সুরের পরশ এনে দিয়েছেন মহানামব্রত। ‘হরিদাসী কমলা হইয়া গেল, নাকি কমলাই চিরকালের মতো পদ্মপলাশলোচন হরির দাসী হইল। কোন্‌টা তার আসল নাম হরিদাসী না কমলা? ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন— হরিদাসীকেই এতদিন কমলা সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। বৈষ্ণব-বেদান্তের ইহাই তো মর্মকথা!’ এর পরে ‘তন্ত্র ও মাতৃসাধনা’ শীর্ষকে তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বে ‘ভক্তে পায় অমৃত, অসুর পায় মৃত্যু’ (পৃ-১১১)-তে জানিয়েছেন— ‘অসুর শব্দের প্রাচীন অর্থ ছিল, যাহার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। তারপর অসুর শব্দের অর্থ হইয়াছিল যাহারা আকার মানে না। অসুর শব্দের শেষ অর্থ সুর-বিরোধী।... শক্তি আছে কিন্তু অসৎ পথে পরিচালিত।’

সমগ্র আসুরিক ভাবগুলির মূর্তি অসুর। আসুরিক শক্তিকেও শুভ পথে আনার জন্য

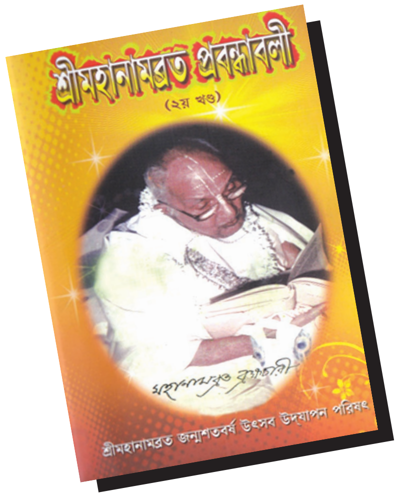

মায়ের চেষ্টা, অসুরও মায়ের সন্তান। এই মা মহামায়ার নিকট রাজাও এসেছেন, বৈশ্যও এসেছেন। ‘মহাদেবীর নিকট রাজা চাহিলেন রাজ্যসুখ ও বিষয়ভোগ আর বৈশ্য চাহিলেন, বিবেক ও বৈরাগ্য। দেবী মহামায়া সুখদা ও মোক্ষদা। চণ্ডীর দুই জন শ্রোতার রহস্য ইহাই। এর পর বৈষ্ণব শিরোমণির বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যাটি অপরূপ। ‘বিষয়-সুখ ও মোক্ষ ছাড়া আর একটি পরম সম্পদ মহাশক্তি মহাদেবী প্রদান করিতে পারেন। তাহা হইতেছে--- শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি (সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী)। মহানামব্রতজীর প্রবন্ধাবলীতে এই বৈষ্ণবী দৃষ্টি সর্বত্র বিরাজ করছে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে, বেদ-বেদান্ত থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য সর্বত্রই দেখি সেই একই বৈষ্ণবী দৃষ্টিভঙ্গী। এই প্রসঙ্গটিতে আরও একটি দিক এসে পড়েছে, তা হলো তাঁর ‘অদোষদর্শিতা’। তিনি নিজেই জানাচ্ছেন (পৃ-৩৮৫) ‘নাভাজীর যে প্রতিজ্ঞা তাহা আমাদের বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। সকলের সুযশই গাইব। কাহারও দোষদর্শন করিব না। বৈষ্ণবদের একটি বিশেষণ আছে অদোষদর্শী। তাহা হইতে বিচ্যুতি হইলে আমরা বৈষ্ণবতা হারাইব।’

‘রামায়ণ ও মহাভারত’ শীর্ষকে (পৃ-১১৯-১২৭) শ্রীরামচরিত- মানস--- ভূমিকাতে লেখক জানাচ্ছেন, ‘কোনও সমাজ বা রাষ্ট্র যদি শান্তিকামী হয় তবে তাহাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য হইবে নরনারীকে ‘সৎ’ করিয়া তোলা। কেবল সদুপদেশে মানুষ সৎ হয় না। শ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্রের ধ্যান ছাড়া মানবজীবন কল্যাণ উন্মুখী হয় না। ...রাষ্ট্র যদি ইচ্ছা করে সমাজকে শান্তিময় করিতে, তাহা হইলে সেউ উদ্দেশ্য সাধনে রামায়ণের মত শক্তিশালী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই।’ মহাকাব্য দর্শন— ভূমিকায় বলেছেন, ‘‘প্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন, ‘ধর্মই শ্রীকৃষ্ণ’। যুধিষ্ঠিরের সকল কর্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ-করুণাপুষ্ট। দুর্যোধনের কর্তৃত্ব অভিমানপুষ্ট, অন্ধ পিতার দ্বারা লালিত।’’

‘শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত’ শীর্ষকে (পৃ-১২৮-৩২৩) লেখক ভাগবত সমুদ্র মন্থন করে যেমন ভাগবতামৃত আমাদের আস্বাদন করার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই সঙ্গে প্রাচীন, মধ্য ও পরবর্তী যুগের আচার্যদের কথা, রাধাকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার কথা, সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণকথা প্রভৃতি অনুষঙ্গও তুলে ধরেছেন। ব্রহ্মচারীজি জানাচ্ছেন, ‘একমাত্র ভাগবত-ধর্মই অবতারবাদকে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছে, অবতারবাদই এই ধর্মকে সুদৃঢ় করিয়াছে। ...অবতারবাদের মূল তাৎপর্য এই যে, আমার জীবনের ও সমাজের দুর্দশার জন্য আমিই চিন্তিত নই, তিনিও ব্যথিত হইয়া কল্যাণের জন্য নামিয়া আসেন। কেবল একবার আসেন নাই, সাত সহস্রবার আসিয়াছেন ও আরও আসিবেন। ভাগবত বলিয়াছেন, ‘অবতারা : হ্যসং খেয়াঃ’।

মানুষকে বলা হইয়াছে সাধন-ভজন উপাসনা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে। ভাগবত বলেন, তোমার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার সামর্থ্যাভাব দেখিয়া তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য নামিয়া আসিয়াছেন। তুমি তাঁহার কাছে যাইতে পার না দেখিয়া তিনি তোমার কাছে আসিয়াছেন। ...(পৃ-৩০৬) পরের পৃষ্ঠার লেখক জানিয়েছেন— 'ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ বলা হইল। মধ্যযুগের কথা ও বর্তমান কথা পরবর্তী প্রবন্ধে বলিব। তৃতীয় নিবন্ধে 'ইসলামের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করিব।' দ্বিতীয় নিবন্ধ আমরা পেয়েছি তবে তৃতীয় নিবন্ধটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমরা পরবর্তী প্রকাশনের জন্য অপেক্ষা করছি।

এই পর্বে ৩১৫ পৃষ্ঠায় সম্পাদকের বক্তব্যটি 'চিন্তারাজ্য আর প্রেমানুভূতির রাজ্য' থেকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' পর্যন্ত অংশটি ৩১৪-৩১৫ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত। পরের বাক্য 'গভীরতম...' প্রুফ সংশোধনযোগ্য। ৩১৪ পৃষ্ঠার ফুটনোট অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রশংসাযোগ্য।

'চৈতন্য মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব-দর্শন' (৩২৪-৪০৭) শীর্ষকে সংগৃহীত প্রবন্ধাবলীতে চৈতন্যদেবের সমকালীন নবদ্বীপ এবং যুগসমস্যার দিশারী চৈতন্য চিন্তা অপূর্ব, অতুলনীয়। 'মহাপ্রভুর সময় সমাজে এ তিন ধারা বিদ্যমান ছিল— ন্যায়ের ধারা, স্মৃতির ধারা এবং তন্ত্রের ধারা। এই তিনটিতে বিরাট পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু 'রস' নামক বস্তুটির আত্যন্তিক ভাবেই অভাব ছিল। ...রসে অনুমিতি ছিল, অনুভূতি ছিল না। ...ভক্তিপ্রেমের রসবন্যায় ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, পুরুষ-নারী নিমাই পণ্ডিতের প্রেমের ধারায়, ভাসিয়া গেল।' (পৃ-৩৩২) 'চৈতন্যদেবের সমকালে বঙ্গদেশের সমাজে এসেছিল এক চরম অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের যুগ। ...জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। তারই মধ্যে তো এলেন শ্রীচৈতন্য। নিয়ে এলেন অভয়মন্ত্র প্রেম ও মৈত্রীর বাণী। জাতি-ধর্ম- নির্বিশেষে আরম্ভ হলো এক মহামিলন যজ্ঞ। কার্ল মার্কসের মতে, 'শ্রীচৈতন্য জাতপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামী উদারনীতির প্রবক্তা।' ...শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগ বা পরোক্ষ প্রশ্রয় পেয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানরা অনেককে তখন জোর করে ধর্মান্তরিত করে চলেছে। ...' (পৃ-৩৫০-৩৫০) ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, 'দিব্যোন্মাদে মত্ত হলেও তাঁর চিত্তে ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র সদা প্রসারিত থাকত।' (পৃ-৩৫২) মহাপ্রভুর প্রধান শিক্ষা-'কায়মনে কোনও জীবে দিবে না উদ্বেগ।'

'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও পরিকর' শীর্ষকে (পৃ-৪০৯-৫৪৪) জগদ্বন্ধুসুন্দরকে গুরুভাবে এবং ঈশ্বরভাবে দেখার কথা বিশদ করেছেন মহানামব্রতজী। জগদ্বন্ধু মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরবর্তী ডাহাপাড়া গ্রামে ১২৭৮ সনের ১৭ বৈশাখ সীতানবমীতে জন্মগ্রহণ করেন। এসেছিলেন সপরিকর। ব্রহ্মচারীজি জানিয়েছেন— 'জাতিগঠনে বন্ধুসুন্দরের বিরাট দান। একটি ফরিদপুরের বুনোদের উদ্ধার, দ্বিতীয়টি রামবাগানের ডোমেদের উদ্ধার। (ফরিদপুরে) 'প্রভু বলিলেন, ''রজনী! তুমি হিন্দুধর্ম ছেড়ে খৃস্টান হবে কেন?... মানুষ কখনও পতিত হয়? সব জীবই কৃষ্ণদাস, তুমিও কৃষ্ণদাস। আজ হতে তোমার নাম হরিদাস।' (পৃ-৪৮৮, ৪৮৯) শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী, চম্পটী ঠাকুর, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, লীলাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, গৌরকিশোর সাহা প্রমুখ পরিকরবৃন্দের কথা বর্ণনার পরে 'বিবিধ' এবং 'মহাজীবন স্মরণে' অধ্যায়। এখানে ব্রহ্মচারীজির জন মনীষীর স্মরণ প্রসঙ্গে তদানীন্তন সমাজ, পরিবেশ প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ আমাদের ঋদ্ধ করেছে। অবশেষে ভূমিকা ও শুভেচ্ছাবাণী এবং ইংরাজী রচনা বিভাগে ব্রহ্মচারীজির বহুমুখী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই। দেশ, ধর্ম ও জাতিগঠন সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তন ও বিশ্লেষণ আমরা দেখতে পাই নারায়ণগঞ্জ সনাতন ধর্মসম্মেলনে সভাপতির ভাষণে। তখন বাংলাদেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। তিনি বলেছেন— 'শ্রীহরির অনুগ্রহে বাঁচিয়া আছি এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ লোক। ছিলাম জিম্মি, আজ স্বাধীন নাগরিক। ...আমাদের ধর্মের নাম হিন্দু ধর্ম। ...এই ধর্মের শাস্ত্রীয় নাম সনাতন ধর্ম। ...ইহা একটি সহজ সরল উদার মানবীয় ধর্ম। তিনটি মাত্র তত্ত্ব জানিলে এই ধর্মের মূল রহস্য বোধগম্য হইবে। (১) মানুষকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। (২) মনুষ্যত্ব লাভের পর দেবত্ব লাভ করিতে হইবে। (৩) দেবত্ব লাভের পথে কোনও দেবমানবকে আচার্য করিয়া তাঁহার নির্দেশ ও আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে।...

হিন্দু ধর্মের অন্যান্য সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি ছয়টি গ-কার দ্বারা বলা হয়— গাভী, গঙ্গা, গয়া, গীতা, গুরু ও গোবিন্দ।... আমাদের বর্তমান সমাজের কিশোর-কিশোরীরা অনেক স্থলে ভ্রান্তপথে চলিতেছে। ধর্মকে 'ওপিয়াম' মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিতেছে। কেহ বা প্রলোভনের মুখে জ্ঞানহারা হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিতেছে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হইতে হইবে ও প্রতিকারের উপায় বাহির করিতে হইবে। ...সংস্কৃত চর্চাকে পূর্ব গৌরবে স্থাপন করিতে হইবে। ...সারস্বত সমাজের উন্নতি বিধান, মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন, দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্র গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ, তীর্থস্থানগুলি উজ্জ্বল করিয়া তোলা— এই সকল কার্যে নিজেরা সচেষ্ট হইব ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।...

আমাদের গ্রামগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয়। দেবমন্দিরে পূজার্চনা তো নাই-ই, নিরাপদে বসবাস করা, পুত্রকন্যাসহ স্বস্তিতে থাকাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিকার কি—সেজন্য সমবেত চিন্তার প্রয়োজন। ...ইহার মূলে রহিয়াছে ভয় ও কাপুরুষতা। ...কেবল একটি কথাই বলিব— আমরা যেন কোনও অবস্থাতেই ভীরু বা কাপুরুষ না হই। ...আমাদের প্রয়োজন প্রত্যেক জেলা, থানা ও গ্রামভিত্তিক সংগঠন ও ধর্মীয় ভিত্তিতে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ...আমরা দিনের পর দিন মরিব না, টলিব না, অন্যকে মরিতে দিব না, সত্য সনাতন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দিব না।...' মহানামব্রতজীর পথ-নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারলে আমরাও অনুভব করব— 'করুণাময়ের করুণার হস্ত আমাদের দিকে প্রসারিত আছে।' একাজে আমরা এক পদ অগ্রসর হলে পরম করুণাময় আমাদের দিকে ত্রিপদ অগ্রসর হবেন। কারণ বেদের অমোঘ বাণী— 'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্'-এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী পরম বৈষ্ণব শ্রীমহানামব্রত জীর ন্যায় আমরাও বিশ্বাস করি— 'কোনওদিন যদি মানবজাতির সুবুদ্ধি জাগে— তাহারা এক পরিবারের মতো বাস করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে এই হিন্দুধর্ম বা ভদ্রলোকের ধর্ম ছাড়া আর কোনও ব্যাপক ছায়াতল নাই, যেখানে সে আশ্রয় লইতে পারে।' (আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ— 'ভদ্রলোকের ধর্ম' (পৃ-৫৮৬)। আশা করি ১ম খণ্ডের ন্যায় এই গ্রন্থটিও (২য় খণ্ড) সর্বজনের নিকট সমাদৃত হবে।

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী
(২য় খণ্ড)
প্রকাশক : শ্রীমহানামব্রত জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষৎ শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, কলিকাতা-৫৯
সংকলক : বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী
মাধুকরী : ২০০ টাকা

বিশেষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

গত ২২ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত অসমের উত্তরাংশের হোজাই (নওগাঁ) জেলার গীতা আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ বিশেষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ।

এই শিক্ষাবর্গে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্য, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছিলেন। বর্গে উপস্থিত ছিলেন সর-সঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত স্বয়ং। এছাড়াও ছিলেন আর এস এসের সহ- সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণগোপাল শর্মা, অখিল ভারতীয় সহ-সেবা প্রমুখ অজিত মহাপাত্র, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত ও কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী, অশোক বেরি, অসীম দত্ত, শান্তরঞ্জন, উল্লাস কুলকার্ণী প্রমুখ। বর্গের সর্বাধিকারীর দায়িত্ব পালন করেন সঙ্ঘের ঝাড়খণ্ড সহ প্রান্ত সঙ্ঘচালক দেবব্রত পাহান। এছাড়াও কার্যবাহ হিসেবে এস. ইবতোম্বু সিং (মণিপুর কল্যাণ আশ্রম সচিব), মুখ্য শিক্ষক হিসেবে পঙ্কজ মণ্ডল (দক্ষিণবঙ্গ সহ প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ), সহ মুখ্য-শিক্ষক হিসেবে হরসিং তেরং (নলবাড়ি বিভাগ প্রচারক) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ উপস্থিতির মধ্যে কেন্দ্রীয় পালক অধিকারী হিসেবে সুনীলপদ গোস্বামী (অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য) ও ক্ষেত্র পালক অধিকারী হিসেবে মানিক দাস (অসম ক্ষেত্র কার্যবাহ)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষক, ডাক্তার আইনজীবী থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী, কৃষক, ব্যবসায়ী, এমনকী সমমনস্ক বিভিন্ন সংগঠনের বিস্তারক ও পূর্ণকালীন কার্যকর্তারাও এই বর্গে অংশ নিয়েছিলেন। বর্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৩। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৭ জন, ঝাড়খণ্ডের ১৪ জন, বিহারের ১৫ জন, অরুণাচল প্রদেশের ৩ জন এবং অসমের ৪ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। বর্গে শিক্ষক হিসেবে ৯ জন এবং প্রবন্ধক ছিলেন ২৫ জন।

সমাবেশ সমাচার

শিলিগুড়িতে সেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণ বর্গ

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের প্রশিক্ষণ বর্গ গত ১১ জুন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির কাছে ঘুঘুমালী সারদা শিশু তীর্থে শুরু হয়েছে। বর্গের উদ্বোধন করেন স্থানীয় আশ্রমের স্বামী শ্যামানন্দ মহারাজ। এছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব-ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্তও উপস্থিত ছিলেন। বর্গে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা থেকে ৬৯ জন সেবিকা যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সম্ভাগ কার্যবাহিকা রীণা সেনচৌধুরী।

২৬ জুন বর্গের প্রকাশ্য সমারোপ অনুষ্ঠান। ২৭ জুন সকালে বর্গ শেষ হবে।

আচার্য প্রশিক্ষণ বর্গ

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের আচার্য/ আচার্যা প্রশিক্ষণ ও অভ্যাস বর্গ সম্পন্ন হলো। এই বৎসর ১৪৭ জন নূতন আচার্য/আচার্যাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো দুটি জায়গাতে। প্রথমটি পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি এবং দ্বিতীয়টি কলকাতার কল্যাণ ভবনে। এই দুটি বর্গে মোট ৬২টি জন আচার্য এবং ৮৫ জন আচার্যা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এবারে ১৫০টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে বলে স্থির হয়েছে। ইতিমধ্যে নূতন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আচার্য/আচার্যারা ১০৬টি কেন্দ্র শুরু করেছেন।

গত বৎসরের ২৮৮টি এবং এই বৎসরের ১০৬টি, মোট ৩৯৬টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বর্তমানে চলছে। নূতন আচার্য/আচার্যদের ৭ দিনের এবং পুরানোদের ৩ দিনের বর্গ বিভিন্ন স্থানে গত ২২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ৬ জুন সম্পন্ন হলো। পুরাতনদের বর্গ প্রান্তের ৪টি জায়গায় হয়েছে।

৮ জন আচার্য-আচার্যা এই বর্গে প্রশিক্ষণ দেন, (১) ষষ্ঠীচরণ সিং চিংড়া, (২) অশোক কুমার মাইতি, (৩) দুর্যোধন সিং সর্দার, (৪) লক্ষ্মণচন্দ্র মাহাতো, (৫) মাধব মাহাতো, (৬) রেবতী মণ্ডল (৭) শ্রীমতী সোনালী মাহাতো, (৮) শ্রীমতী চাঁদমণি কিস্কু। বর্তমানে জেলা অনুসারে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা : পশ্চিম পুরুলিয়া-৭৬, পূর্বপুরুলিয়া-৭৭, বাঁকুড়া-৩৫, পশ্চিম মেদিনীপুর-৩১, পূর্ব মেদিনীপুর-৫৮, হুগলী-৪, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-২৯, উত্তর চব্বিশ পরগণা-৫, নদীয়া-১৩, মুর্শিদাবাদ-৩৫, বীরভূম-৬ এবং বর্ধমান-১৭।

মঞ্জুলী ভট্টাচার্য প্রয়াত

মঞ্জুলী ভট্টাচার্য পরলোক গমন করলেন গত ১৩ জুন সন্ধ্যায় বাগুইআটীর একটি নার্সিংহোমে।

তিনি সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের মাতৃশক্তি প্রমুখ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর।

কিডনীজনিত অসুস্থতার কারণে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকে নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন।

তাঁর স্বামী সুভাষ ভট্টাচার্য সংস্কার ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সম্পাদক। স্বামী ছাড়াও একমাত্র কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র-কে রেখে গেছেন।

সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে আগামী ১ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার কল্যাণ ভবনে।

সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১০ জুন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১১—২০১২ অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার মানিকতলাস্থিত নরেশ ভবনে। রবিবার সকালে উদ্বোধনের পর প্রান্তীয় সভাপতি তপন গাঙ্গুলী, ক্ষেত্রীয় সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য, অখিল ভারতীয় সহনাট্য প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য, বিমল লাঠ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। বিকাশ ভট্টাচার্য কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচন পর্বের মধ্য দিয়ে ২০১২-১৩ বর্ষের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদে পুনর্নির্বাচিত হন যথাক্রমে তপন গাঙ্গুলী, নীলাঞ্জনা রায় ও শ্যামল ভট্টাচার্য। সংগঠন সম্পাদক হিসাবে ভরত কুণ্ডুর নাম ঘোষিত হয়। সুকুমার সেন এবং দেবাশীষ ভট্টাচার্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম হিসাবে ২০১২-১৩ কর্মবর্ষে সংগঠনের বিশেষ দায়িত্বে থাকবেন। সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য, অঙ্কন, সাহিত্য, মাতৃশক্তি প্রভৃতি বিভাগ ও কার্যালয় প্রমুখ, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর তালিকাটি ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক। বিশেষ উল্লেখনীয় এই বছরে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ গুরু বিশ্বাস এবং অরুণ চক্রবর্তী প্রান্তের সহ সভাপতির পদে মনোনীত হন।

২০১২-২০১৩ অনুষ্ঠিতব্য আঞ্চলিক শিল্পী সম্মেলনের প্রাথমিক রূপরেক্ষা, সাংগঠনিক আলোচনা এবং পরিশেষে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা বিকেলে সমাপ্ত হয়।

মঙ্গলনিধি

উত্তর বীরভূম জেলার সহ শারীরিক প্রমুখ আশীষ মণ্ডলের বিবাহ উপলক্ষে ১৫৫১ টাকা মঙ্গলনিধি হিসাবে প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর বীরভূম জেলা কার্যবাহ অনিমেষ মুখোপাধ্যায়, বীরভূম বিভাগ ব্যবস্থা প্রমুখ চিত্তরঞ্জন মণ্ডল ও সঙ্ঘের অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ।

শব্দরূপ-৬৩১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

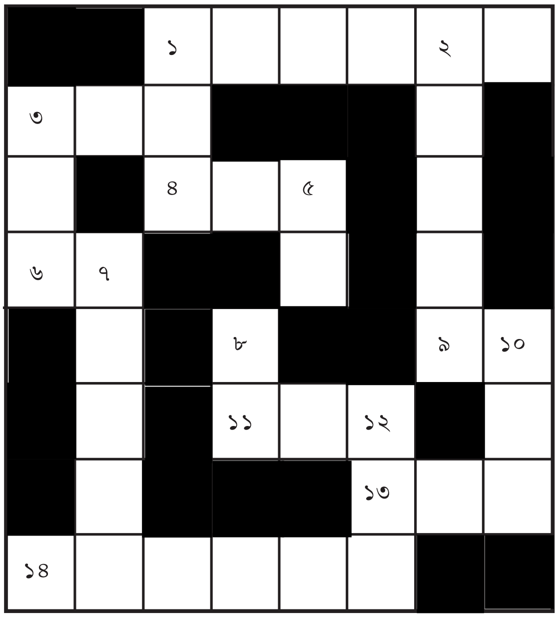

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. সারদা মায়ের জন্মস্থান, ৩. গুজরাটি নৃত্য-গীত, ৪. স্বনাম-প্রসিদ্ধ দরবেশ, ৬. ''অঞ্জলি— মোর সঙ্গীতে'', ৯. কদম্বপুষ্প বা বৃক্ষ, ১১. বেগুন, ১৩. মৃতদেহাশ্রয়ী প্রেত; শিবের অনুচর; তালভঙ্গ (সঙ্গীতে), ১৪. রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান।

উপর-নীচ : ১. ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম-জননী, ২. সরস্বতী, ৩. প্রেমসঙ্গীত (আরবিতে), ৫. কুমীর, ৭. যাতে সত্য বলিবার জন্য শপথের পাঠ লেখা থাকে, ৮. বোবা, মূক, ১০. ডোবা, বিল, ১২. যক্ষরাজ, মহাধনী।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ভা			সু	যো	ধ	ন	
র			যে		নে		
বি	ভী	ষ	ণ		শ	কু	নি
	ম					পো	
	র					কা	
সৃ	তি	কা		সু	প্র	ত	র
		লি		তা			ক্তি
	ই	ন্দী	ব	র			কা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৩১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ জুলাই, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
''চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি''—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস
''ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—
B.H.M.S. (Cal.),F.W.T., P.E.T.''
কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।
চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।
বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।
দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।
মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ২

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

হংকংয়ে এবার বিশ্ব হিন্দু অর্থনৈতিক সম্মেলন

সংবাদদাতা॥ ওয়ার্ল্ড হিন্দু ইকনমিক কনফারেন্স ৩০ জুন থেকে পয়লা জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে হংকংয়ে। ৩০ জুন থেকে হংকংয়ে দুই দিনের এই বিশ্ব হিন্দু অর্থনৈতিক সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসাবে আসছেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী ডঃ নবীনচন্দ্র রামগুলাম। ভারতের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ডঃ সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী, আই আই এফ এম-এর অধ্যাপক আর বৈদ্যনাথন, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর ডঃ গৌতম সেন। ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ভারতের চন্দ্রাভিযান প্রকল্পের প্রধান জি মাধবন নায়ার। পরম এবং পদম সুপার কম্পিউটার- এর আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী ডঃ বিজয় ভাটকর প্রমুখ। এই বিশ্ব হিন্দু অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ওয়ার্ল্ড হিন্দু ইকনমিক ফোরাম। কম্যুনিস্ট চীনের সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকা হংকংয়ে এই হিন্দু অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন বিশ্ব অর্থনীতির সমস্ত স্তরেই কৌতূহল সঞ্চার করেছে। সম্মেলনের মূল ভাবনা হচ্ছে হিন্দুদের জন্য একটি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক কাঠামো রচনা করা। যাকে ভিত্তি করে তারা একদিকে হিন্দু সমাজকে সমৃদ্ধ করবে এবং অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে উল্লেখযোগ্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। প্রসঙ্গত, সারা বিশ্বজুড়ে একশ' কোটির অধিক হিন্দু জনসংখ্যা। বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ হিন্দু। নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রয়োজন অবিভক্ত ভারতকেন্দ্রিক হিন্দু সমাজ কখনও অন্যদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেনি। পক্ষান্তরে সমৃদ্ধ জনকল্যাণপরায়ণ হিন্দু অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনীতির উপর আক্রমণ হেনেছে শক, হুন, পাঠান, মোগল, বৃটিশ প্রভৃতি। বিপর্যস্ত করেছে হিন্দুর অর্থনীতিকে। ওয়ার্ল্ড হিন্দু ইকনমিক ফোরাম চায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সফল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঐক্য। যা হিন্দু তরুণ-তরুণীদেরকে প্রেরণা ও সহায়তা দেবে নিজ উদ্যোগে ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন, শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে।

বেদবিজ্ঞান সম্মেলন এবার ব্যাঙ্গালোরে

আগামী ৬—৮ জুলাই, ২০১২ ব্যাঙ্গালোরে এক সর্বভারতীয় বেদ-বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সারা ভারতবর্ষ এবং বিদেশ থেকেও বহু বেদজ্ঞ পণ্ডিত এই সম্মেলনে যোগদান করবেন। বেদে নিহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হবে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে শালিনী ভাট এই সংবাদ জানিয়েছেন।

২০১০-এ ১১-১২ নভেম্বর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে আয়োজিত বেদ-বিজ্ঞান সম্মেলনের ফাইল-চিত্র। আয়োজক ছিল ছত্তিশগড় বিজ্ঞান ভারতী, অখিল ভারতীয় পীঠ পরিষদ, পুরী, শিক্ষা-সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস, নতুন দিল্লী।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ৭.০০ টাকা
বার্ষিক (সডাক) গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
25 June - 2012

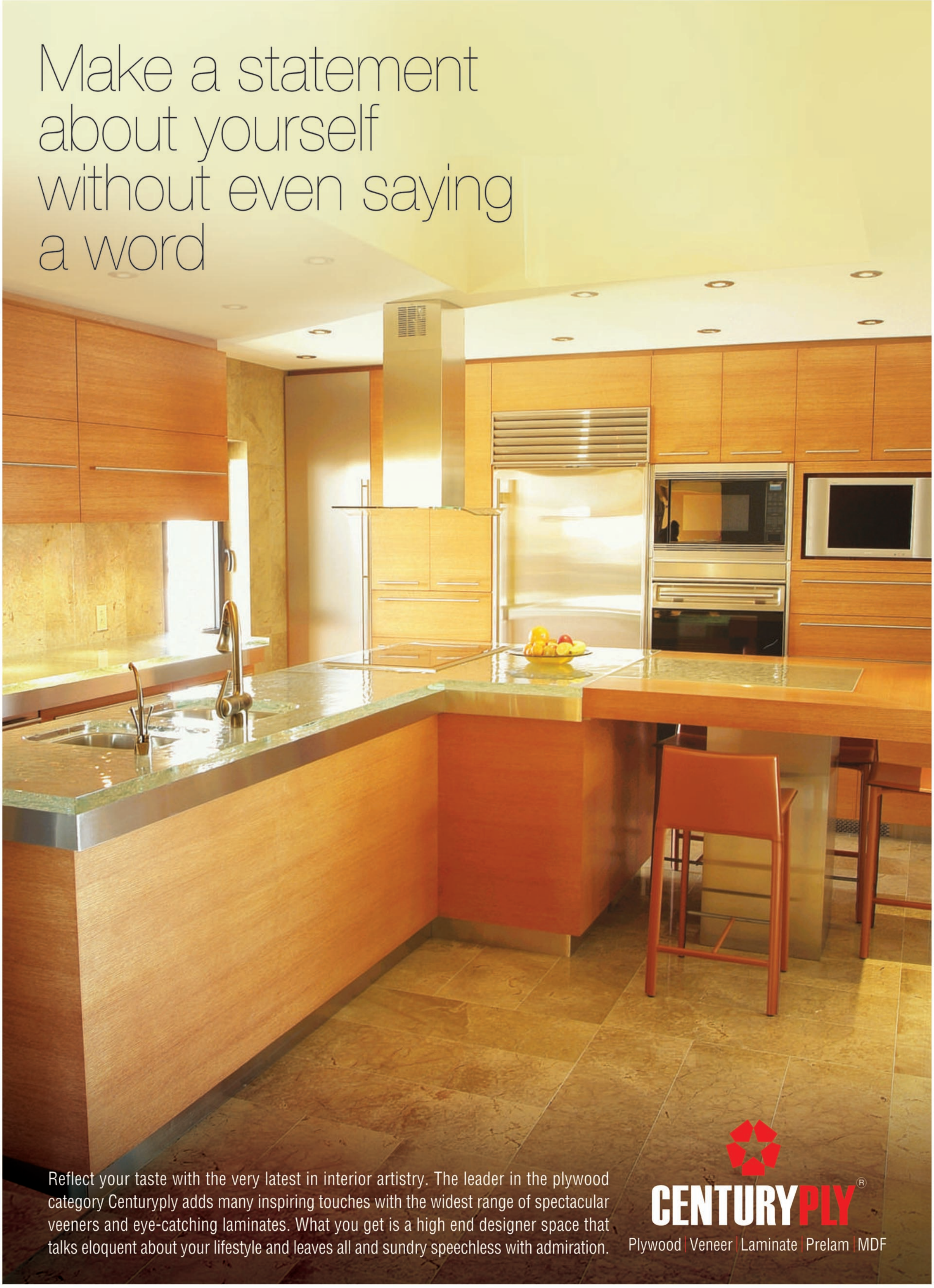

দাম : ৭.০০ টাকা